লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৯ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নবপর্যায় ৮৪ বর্ষ | ১ম সংখ্যা

ঈদুল আযহা সংখ্যা

রেজি. নং- ডি. এ- ১২ | ৩১ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ | ৪ জিলহজ্জ, ১৪৪২ হিজরি | ১৫ যহূর, ১৪০০ হি. শা. | ১৫ জুলাই, ২০২১ ঈসাব্দ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
اِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

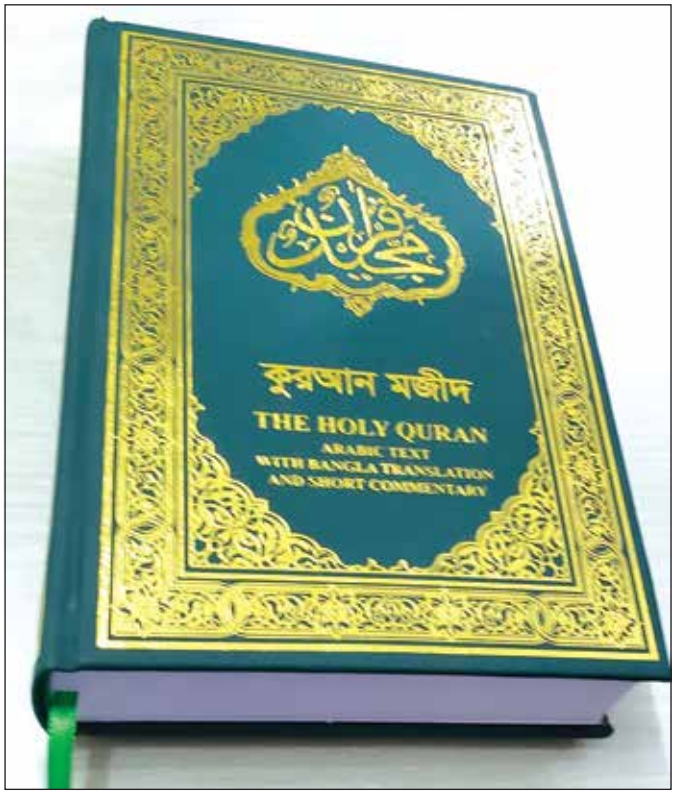

‘পবিত্র কুরআন পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে’

বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কুরআন স্পষ্টাক্ষরে এবং সহজে বহনযোগ্য আকারে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রত্যেককে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করে নিজ নিজ কপি সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে

‘পর্দা’ – পুস্তক।

প্রিয় হুযূর (আই.)-এর নির্দেশে সেন্ট্রাল বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে পুস্তকটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় ইশায়াত দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহতরম
ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে
ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে সবাইকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা– **ঈদ মোবারক!**

আল্লাহ্ তা'লা এই ঈদ আমাদের সবার জন্য সবদিক দিয়ে মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর করুন, আমীন।

আমরা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতি বছর ঈদুল আযহার দিন পশু কুরবানী করে থাকি আর সৌভাগ্যবান হাজীরাও আরাফাতে ৯ই যিলহজ্জ তারিখে অবস্থান করার পরের দিন বা এর পরের দুই দিন পর্যন্ত হেরেম শরীফের সীমার মাঝে পশু কুরবানী করে থাকেন। কিন্তু এই ঈদের তাৎপর্য কি কেবল বাহ্যিকভাবে পশু জবাই করে এর মাংস খাওয়া বা বণ্টন করার মাঝে সীমাবদ্ধ? মোটেও না! এই ঈদের শিক্ষা ও তাৎপর্য অনেক গভীর। আজ থেকে চার হাজার বছরেরও অধিক সময় পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত হাজেরা (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) সেসব ত্যাগের আদর্শ উপস্থাপন করেছিলেন এবং তাঁদেরই দোয়ার ফলে মহানবী (সা.) তাঁদেরই বংশে আবির্ভূত হয়ে কুরবানী ও ধর্মের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেয়ার যে বিরল আদর্শ রেখে গেছেন, সেগুলো আমাদের প্রত্যেকে যেন বাস্তবায়ন করে- এ কথা স্মরণ করানোর জন্য এই ঈদের আনুষ্ঠানিকতা। তা না হলে স্বচ্ছল মুসলমানরা সারা বছরই উট, গরু বা ছাগলের মাংস খেয়েই থাকে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর বিষয়টি যা পবিত্র কুরআনে সূরা আস-সাফ্‌ফাতের ১০১ নং আয়াত থেকে ১১১ নং আয়াতের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশেষভাবে আমাদের ওয়াকেফে যিন্দেগী ও ওয়াকেফে নও সদস্যদের জন্য অনুকরণীয় ও অবশ্য পালনীয় আদর্শ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা যেন সর্বস্ব ত্যাগ করে হলেও ধর্মসেবা ও ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদের অঙ্গিকার পূর্ণ করি। আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও নৈকট্য অর্জনের জন্য যেন জীবন কাটাই। জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা বা জগতপূজা যেন কখনই আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য না হয়। এই ত্যাগের মানসিকতা আমাদের দিতে পারে অপার শান্তি ও তৃপ্তি– এরই মাধ্যমে আমরা পূর্ণ করতে পারি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র জন্য বিলীন হবার মাঝেই মানবজীবনের স্বার্থকতা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে এই ঐশী প্রেমসুধা পান করে পরিতৃপ্ত হবার সৌভাগ্য দান করুন– তবেই এই ঈদ উদ্‌যাপন সার্থক হবে! আবারও সবাইকে **'ঈদ মোবারক'!**

শুভেচ্ছান্তে
আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

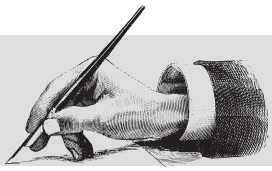

বিশেষ ঐশী পুরস্কার লাভ করতে বড় বড় কুরবানী করতে হয়

মানবীয় স্বভাব অল্প কষ্টে অধিক পুরস্কার আশা করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিশেষ পুরস্কার লাভ করতে হলে বড় বড় কুরবানী ও আত্মত্যাগের পরীক্ষা দিতে হয়। পবিত্র কুরআনে আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এমন-ই আত্মত্যাগের ঘটনা দেখতে পাই। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: পবিত্র কুরআনের আয়াত: "ওয়া ফাদাইনাহু বিযিবহিন আযীম" [তথা এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদিয়া (তথা মুক্তিপণ) দিয়েছিলাম।] (স্মরণ থাকে) নবী-রসূলগণ যে বড় বড় মর্যাদা লাভ করেছেন তা এমনিতেই লাভ হয় নি বরং এর জন্য কঠিন পরীক্ষা দিয়েছেন এবং সেসব পরীক্ষায় তাঁরা ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করে সফল হয়েছেন, এর ফলে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বড় বড় মর্যাদা লাভ করেছেন। দেখুন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কত বড় পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তিনি নিজ সন্তানকে কুরবানী করার জন্য হাতে ছুরি ধারণ করেছেন।... হযরত ইবরাহীম (আ.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তার (আ.) প্রিয় সন্তানকেও রক্ষা করেছেন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন কেননা তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, তিনি সেই পুত্রকে কুরবানী হতে রক্ষা করেছেন অন্যথায় ইবরাহীম (আ.) তো প্রায় জবাই করেই ফেলেছিলেন। এর ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.) 'সাদেক' উপাধী লাভ করেছেন। এছাড়া তওরাতে লেখা আছে, খোদা তা'লা বলেছেন, ইবরাহীম! আকাশের নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না; এমনিভাবে তোমার সন্তান-সন্ততি গণনা করে শেষ করা যাবে না। সামান্য কয়েক মুহূর্তের কষ্ট ছিল আর তা তো অতিক্রান্ত হয়েই গেছে কিন্তু প্রতিফলসরূপ কত বড় পুরস্কার লাভ তিনি করেছেন! *(আল বদর, সপ্তম খণ্ড, ১৬ই জানুয়ারী ১৯০৮ সাল, পৃষ্ঠা: ৫)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) "ওয়া নাদাইনাহু আইঁয়া ইবরাহীম, কাদ সাদ্দাকতার রুইয়া, ইন্না কাযালিকা নাজযিল মুহসিনীন" *(সূরা আস সাফফাত: ১০৬)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন:

"সূফীগণ লিখেছেন, সলূকের প্রথম ধাপে যেসকল রুইয়া বা ওহী লাভ হয়, এটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন নয়, কেননা এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো সেই সলূকের পথে অন্তরায় হয়ে যায়। এর মাঝে মানুষের নিজস্ব কোন অবদান নেই কেননা এটি তো আল্লাহ্ তা'লার কাজ অর্থাৎ তিনি চাইলে কাউকে ভাল স্বপ্ন দেখাতে পারেন অথবা এলহাম করতে পারেন, এখানে ব্যক্তির অবদান কী? ভেবে দেখুন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি অনেক ওহী হতো কিন্তু সেগুলোর কোথাও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এই এলহাম হয়েছিল, ঐ ওহী হয়েছিল বরং উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ইবরাহীমুল্লাযী ওয়াফ্‌ফা (সূরা আন নজম: ৩৮) ইবরাহীম হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পরিপুর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন আর তা হল, "ইয়া ইবরাহীমু কাদ সাদ্দাকতার রুইয়া, ইন্না কাযালিকা নাজযিল মুহসিনীন" আর এই বিষয়টিই মানুষের অর্জন করা উচিত। এই বিষয় যদি মানুষের মাঝে সৃষ্টি না হয় তাহলে রুইয়া বা এলহাম দ্বারা কী লাভ? মু'মিন সর্বদা পুণ্যকর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। যদি পুণ্যকর্মের দিকে দৃষ্টি না থাকে তাহলে তার আল্লাহ্‌র শাস্তির অধীনে নিপতিত হওয়ার আশংকা আছে। আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা আর এর জন্য প্রয়োজন নিষ্ঠা, সততা এবং বিশ্বস্ততা। বুলিসর্বস্ব চেষ্টার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হই তখন আল্লাহ্ তা'লাও বরকত দান করেন এবং নিজ বরকত ও কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন আর রুইয়া ও ওহীকে শয়তানী প্রভাব থেকে পবিত্র করে দেন আর এলোমেলো স্বপ্ন থেকে রক্ষা করেন। অতএব এ বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, রুইয়া এবং এলহাম মানবীয় যোগ্যতার মাপকাঠিতে মাপা সমীচীন নয়। অনেক এমন লোক দেখা গেছে যাদের প্রতি রুইয়া ও এলহাম হয়েছে কিন্তু তাদের পরিণাম ভাল হয় নি কারণ তারা এটিকে তাদের পুণ্যকর্মের প্রতিফল ভেবেছে। সেই সংকীর্ণ দ্বার তথা সততা ও বিশ্বস্ততার দ্বার- সেখান দিয়ে অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। আর রুইয়া এবং এলহাম হতে থাকল, আমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকলাম, চেষ্টা-প্রচেষ্টা থেকে হাত গুটিয়ে রাখলাম– এটি হবে আমাদের আত্মম্ভরিতা, আল্লাহ্ তা'লার কাছে এমনটি অপছন্দনীয়।" *(আল বদর, নং: ৩, ৭-১৭ মে ১৯০৪, পৃষ্ঠা: ১০)*

সূচিপত্র

১৫ জুলাই ২০২১

কুরআন শরীফ ৪

হাদীস শরীফ ৫

অমৃতবাণী ৬

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) ৭

১১ জুন, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১০

বিষয়বস্তু: হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

৩১ জুলাই, ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **ঈদুল আযহার খুতবা** ২০

পর্ব-১৭ ২৭
প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

সীরাতুল মাহদী (আ.) ৩১
প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)
ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

কবিতা: ৩২
গোলামে আহমদ (আ.)
সোহেল মাহমুদ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের 'সালানা জলসা' ৩৩
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য ৩৫
মাহমুদ আহমদ সুমন

দেশ ও জাতিভেদে 'ঈদুল আযহা' ও ঈদের দর্শন ৩৭
(একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ)
মীম মিজান

স্মৃতিচারণ– আমার পিতা মরহুম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ৪০
মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয় ৪৩
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ ৪৬

সংবাদ ৪৭

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৪৮

প্রচ্ছদ পরিচিতি:
আরাফাত ময়দানের স্থিরচিত্র, ৯ জিলহজ্জ, ১৪৪০ হিজরি
(ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٣﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٤﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٥﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٧﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١٠﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١١﴾

(সূরা আস সাফ্‌ফাত: আয়াত ১০১-১১১)

১০১। (ইবরাহীম বলল,) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল পুত্র দাও।

১০২। তখন আমরা তাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০৩। অতঃপর যখন সেই পুত্র তার সাথে দৌড়ানোর বয়সে উপনীত হল, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি, অতএব তুমি চিন্তা করে বল, তোমার কি অভিমত? সে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি যা আদিষ্ট হয়েছ, তা-ই কর, ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবে।

১০৪। অতঃপর যখন তারা উভয়ই (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করল এবং সে (নিজ পুত্রকে) জবাই করার জন্য উপুড় করে শোয়াল।

১০৫। তখন আমরা তাকে ডাক দিয়ে বললাম, 'হে ইবরাহীম!

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করে দেখিয়েছ। নিশ্চয় আমরা এরূপেই সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

১০৭। নিশ্চয় এ এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

১০৮। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদিয়া (তথা মুক্তিপণ) দিয়েছিলাম।

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীদের মাঝে তার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করলাম।

১১০। ইবরাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১১১। এরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ـ صلى الله عليه وسلم

(মুসনাদ আহমদ: ৩১২২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কুরবানী দেয়ার ইচ্ছা করলে দুটি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত, ধূসর বর্ণের ও খাসিকৃত মেষ ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি নিজ উম্মতের যারা আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর (সা.) নবুয়্যতের সাক্ষ্য দেয় তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর (সা.) পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতেন।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَلاَ نُسُكَ لَهُ"

(সহীহ বুখারী: ৯৫৫)

বারাআ বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ঈদুল আযহার দিন নামায আদায় শেষে আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। খুতবায় তিনি (সা.) বলেন, 'যে আমাদের মত নামায আদায় করল এবং আমাদের ন্যায় কুরবানী করল, তার কুরবানীর রীতি সঠিক হল। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করল তার কুরবানীর রীতি সঠিক হল না।

وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ *(তিরমিযী: ৫৪২, ইবনে মাজাহ: ১৭৫৬)*

আব্দুল্লাহ্ বিন বুরায়দাহ নিজ পিতা বুরায়দা (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) ঈদুল ফিতর-এর দিন কিছু না খেয়ে বের হতেন না আর ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে কিছু খেতেন না।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

(সহীহ বুখারী: ৯৫৬, সহীহ মুসলিম: ৮৮৯)

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (ঘর থেকে) বের হয়ে ঈদগাহের ময়দানে গমন করতেন। প্রথমে তিনি (সা.) সেখানে গিয়ে ঈদের নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি (সা.) মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। মানুষ তখন নিজ নিজ সারিতে বসে যেত। তিনি (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন এবং উপদেশ দিতেন। কোন বাহিনী পাঠাতে হলে তাদেরকে মনোনীত করতেন অথবা কাউকে কিছু নির্দেশ দেয়ার থাকলে দিতেন। এরপর তিনি (সা.) ঈদগাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৯০৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় বয়আত গ্রহণের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সকলের উদ্দেশ্যে বলেন:

প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে আমার হাতে বয়আত করে, তার উপলব্ধি করা উচিত যে, তার বয়আতের উদ্দেশ্য কী? সে কি জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বয়আত করল না-কি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বয়আত করল? অনেক এমন দুর্ভাগা আছে, যারা কেবল জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে বয়আত করে থাকে। বয়আতের ফলে তাদের মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয় না। আর প্রকৃত বয়আতের ফলে যে প্রকৃত বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞানের নূর লাভ হওয়ার কথা, তা তাদের লাভ হয় না। তাদের কাজে-কর্মে কোন গুণাগুণ এবং স্বচ্ছতা থাকে না। তারা পুণ্যে উন্নতি লাভ করে না এবং পাপ থেকে পরিত্রাণও পায় না। এমন লোক যারা এ জগতকেই নিজেদের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাদের স্মরণ রাখা উচিত,

'দুনিয়া কয়েক দিনের মাত্র, পরিশেষে খোদার কাছেই ফিরতে হবে'– ফার্সী পংক্তির অনুবাদ

এ ক'দিনের দুনিয়া তো যেকোনভাবে পার হয়ে যাবে, হয়তো অস্বচ্ছলতায় নতুবা স্বচ্ছলতায়। কিন্তু পরকালের বিষয় বড়ই কঠিন, সেটি চিরস্থায়ী এবং তার সমাপ্তি নেই। অতএব সেই জায়গায় যদি সে এ অবস্থায় যায় যে, খোদা তা'লার কাছ থেকে সে নিজেকে পবিত্র করে নিল আর আল্লাহ্‌র ভয় তার হৃদয়ে জাগরূক আর সে গুনাহ থেকে তওবা করে প্রত্যেক গুনাহ থেকে সদা বিরত থাকে যেগুলোকে আল্লাহ্ গুনাহ নামে আখ্যায়িত করেছেন, তাহলে খোদা তা'লার কৃপা তাকে টেনে তুলবে আর সে এমন অবস্থানে থাকবে যেখানে খোদা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং সে নিজ প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আর সে যদি এরূপ না করে বরং ভ্রুক্ষেপহীনভাবে নিজ জীবন কাটিয়ে দেয় তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তাই বয়আত করার সময় এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, সে কী উদ্দেশ্যে বয়আত করছে আর এর দ্বারা কী উপকার সাধিত হবে? কিন্তু যদি ধর্মের খাতিরে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বয়আত হয় তবে এমন বয়আত কল্যাণমণ্ডিত এবং নিজ মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিজের মাঝে ধারণকারী যা দ্বারা তার লাভ ও কল্যাণের পূর্ণ আশা করা যায়- যা সত্যিকার বয়আতের ফলে লাভ হয়। প্রথমতঃ সে নিজ গুনাহ থেকে তওবা করবে আর প্রকৃত তওবা মানুষকে খোদা তা'লার প্রিয় বানিয়ে দেয় আর তাঁর পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা লাভ হয়, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: **"ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিনা ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহ্হিরিন"** (সূরা আল বাকারা: ২২৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তওবাকারীদের পছন্দ করেন এবং তাদেরকেও পছন্দ করেন যারা গুনাহ্‌র আকর্ষণ থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করে। প্রকৃতপক্ষে তওবা এমন একটি বিষয়, যখন সেটি তার প্রকৃত আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ করা হয় তখন তওবার সাথে সাথেই মানুষের মাঝে এক পবিত্রতার বীজ বপন করা হয় যা তাকে পুণ্যের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়। এ কারণেই মহানবী (সা.)-ও বলেছেন যে, গুনাহ থেকে তওবাকারী এমন যেন সে কোন গুনাহ করে নি। অর্থাৎ তওবার মাধ্যমে পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা লাভ হয়। ইতিপূর্বে তার যে অবস্থাই ছিল আর যে অপকর্ম এবং তার আচার-আচরণে যে অসামঞ্জস্য পাওয়া যেত, আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় সেগুলো ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে একটি সন্ধি-চুক্তি করা হয় ফলে এক নতুন হিসাব শুরু হয়। অতএব সে যদি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে একনিষ্ঠভাবে তওবা করে তবে তার নিজ গুনাহের নতুন হিসাব খোলা উচিত নয় এবং সে যেন গুনাহের অপবিত্রতা দ্বারা নিজেকে কলুষিত না করে বরং সর্বদা ইস্তেগফার এবং দোয়ার সাথে নিজ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগী থাকে আর খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার চিন্তায় লেগে থাকে এবং নিজ সেই জীবন নিয়ে অনুতপ্ত ও লজ্জিত থাকে যে জীবন তওবার পূর্বে গত হয়েছে।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫; আল হাকাম, সপ্তম খণ্ড, ৩৮ নং, পৃষ্ঠা: ২, ১৭ অক্টোবর-১৯০৩)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৬০তম কিস্তি)

আমি পূর্বেও লিখেছি যে, আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ অত্যন্ত আক্ষেপজনক। আপনার প্রতি এ শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, মৌখিকভাবে কোনো কথা বলা যাবে না। শুধুমাত্র লিখিত বিষয়বস্তু পড়ে শুনাতে হবে। এর বাইরে কোন কিছু বলা যাবে না যেমন কিনা আপনার ইশতেহারেও লিখেছেন কিন্তু আপনি জানেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ শর্তটি আপনি ভঙ্গ করেছেন এবং লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনাবার জায়গায় মৌখিকভাবে ওয়াজও করেছেন, তখন আমি আপনাকে বলি যে, এখন মৌখিকভাবে আমারও কিছু বলার অধিকার প্রাপ্য হবে। অতএব, আমি যদি লিখিত বক্তব্য শোনাবার সময় একবার কয়েকটি কথা মৌখিকভাবে বলেও থাকি তাহলে এটা কি অঙ্গীকার-ভঙ্গ ছিল? নাকি এটা ছিল আপনার অঙ্গীকার-ভঙ্গের সঙ্গে অদল-বদল মাত্র। হযরত মুহাম্মদ হাসান সাহেব যিনি একজন রঈস এবং আপনার বন্ধু যাঁর বাড়িতে আপনি এইসব অঙ্গীকার-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। গর্ব ও অহংকার ভরা আপনার উগ্রতা আপনাকে এ অপরাধ করায়। বাহাসের শেষ দিনটিতেও একই কর্ম আপনার দ্বারা সংঘটিত হয় এবং এছাড়াও আপনি বন্যদের মত ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েন। যে কারণে **"আ'রিয"**– ('মুখ ফিরিয়ে নাও') আয়াত-করীমার হুকুম অনুযায়ী আপনার থেকে দূরে সরে থাকা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায় এবং আপনাকে আপনার লিখিত বিষয়ের কপি দেওয়া হয় নাই। হে হযরত মৌলভী সাহেব! আপনার প্রতিটি কথা ও শব্দ গর্ব ও অহংকারে ভরপুর এবং প্রতিটি বাক্য **"আনা খাইরুম্ মিনহু"** (আমি তার চেয়ে উত্তম) (ইবলিশের উক্তি)-এর দুর্গন্ধে ভরা। একটি কিতাবের নাম ভুল হওয়ার অভিযোগ আমাকে দেওয়াটায় কি কোনো ভদ্রতা ছিল? আর তা-ও হীন স্বভাব মোল্লাদের মত সম্পূর্ণ মিথ্যা! আমি চাইলে আপনার 'সার্ফ ও নহ্ভ'-এর আরবী ভাষার ব্যাকরণগত ভুল তখনই মানুষকে দেখিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু এ রকম হীনতা প্রদর্শন আমার দ্বারা কখনও সম্ভব ছিল না। আমি দেখতে পাচ্ছি এবং দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে আপনার উগ্রতা ও হীনমন্যতা থেকে আপনি যদি তওবা না করেন তাহলে খোদা তা'লা তাঁর অমোঘ বিধান অনুযায়ী আপনার জ্ঞানের গোমর ফাঁস করে দেবেন এবং আপনার আসল চেহারা আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। আপনি যখন এ অধম সম্পর্কে বলেন যে, এ ব্যক্তি অজ্ঞ মুর্খ ও মিথ্যারোপকারী তখন আপনার এইসব চালাকি দ্বারা মানুষকে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আপনি একজন বড় আলেম, বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী এবং সত্যবাদী ব্যক্তি। কিন্তু নিজের মুখের জোরে মানুষ কোন মর্যাদা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশী জ্যোতিঃ এর সঙ্গে যুক্ত না হয় সেটা জ্ঞান নয়, বরং অজ্ঞতা, সেটা মগজ নয় বরং শুষ্ক হাড়গোড়। আমাদের দ্বীন উর্ধ্বলোক হতে আগত ঐশী দ্বীন। কেবল সে-ব্যক্তিই এটি উপলব্ধি করতে পারে, যে নিজে উর্ধ্বলোকের হয়ে থাকে। খোদা তা'লা কি বলেন নি, **'লা ইয়ামাস্সুহু ইল্লাল্ মুতাহ্হারুন'**– [অর্থাৎ, 'পবিত্রকৃত ব্যক্তিগণ ছাড়া এটি অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারে না'- (আল্ ওয়াকেয়া: ৮০) –অনুবাদক]। আমি কখনও মানব না যে, ঐশীজ্ঞান এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গভীর তত্ত্বাবলী পার্থিব লোকেরা নিজে নিজে আহরণ ও আয়ত্ত করতে সক্ষম। পার্থিব লোকেরা 'দাব্বাতুল আরয' (মাটির কীটতুল্য) হয়ে থাকে। তারা 'মসীহুস্-সামা (উর্ধ্বলোক স্পর্শকারী মসীহ্ তুল্য) নয়। 'মসীহুস্-সামা' উর্ধ্বলোক হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এবং তাঁর (তত্ত্বপূর্ণ) ধারণা উর্ধ্বলোককে 'মাসাহ্' বা স্পর্শপূর্বক আগত এবং 'রূহুল কুদ্স' তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ কারণে সদা ঐশী জ্যোতিঃসহ তিনি অবস্থান করেন। কিন্তু 'দাব্বাতুল্ আর্যে'র সঙ্গে থাকে নোংরামী

ও অপবিত্রতা। এমনকি তারা পূর্ণ মানবাকৃতিসম্পন্ন নয় বরং তার কতক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকারগ্রস্তও হয়ে থাকে। এ কারণেই আমি বলেছিলাম যে, আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না, আপনি পবিত্র হাদীসের প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। খোদা তা'লা আপনার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন এবং আপনাকে আপনার চেহারা দেখিয়ে দেবেন। আফসোস হয় যে, আপনার অপরিপক্ক কথাগুলোর দরুণ আপনি লজ্জিতবোধ করেন না। আর সম্পূর্ণ নিরুত্তর হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বিশেষ হাদীসবিশারদ হওয়ার দাবি চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনি বলেছিলেন যে, হাদীস শরীফে 'আদ্-দাজ্জাল'-শব্দ দ্বারা শুধু মসীহ্-সম্পৃক্ত দাজ্জালকেই বুঝায় না, বরং অন্যান্য দাজ্জাল সম্পর্কেও দাজ্জাল শব্দটির 'সিহাহ্' তথা (ছয়টি) প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আপনাকে যখন বলা হল, "এটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র হাদীসের প্রকৃত জ্ঞান হতে আপনি একেবারে বঞ্চিত। আপনি যদি মসীহ্-সম্পৃক্ত দাজ্জাল ছাড়া অন্য কোন দাজ্জাল সম্পর্কে 'সিহাহ্ সিত্তা'য় প্রয়োগ দেখিয়ে দেন, তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আপনাকে পাঁচ রুপি প্রদান করা হবে। তখন আপনি এমন চুপ হলেন যে, আপনার পক্ষে এর কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। এটি হল দম্ভ ও অহঙ্কারের শাস্তি। জ্ঞানশূন্যতা বা অজ্ঞতা কি এরই নাম বা অন্য কোন বস্তুর নাম? আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র হাদীসের উল্টো অর্থ করলেন এবং কেবল মিথ্যা রচনাস্বরূপ কীসের থেকে কী অর্থ বানিয়ে শুনিয়ে দিলেন। এটাই কি হাদীসবিশারদ হবার পরিচয়? এছাড়া, আপনি এ মর্মেও দাবি করেছিলেন যে, আপনি কিনা বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহে পরস্পর বিরোধ দূর করতে পারেন। এর উত্তরে আপনাকে বলা হয়েছিল, আপনি যদি সম্মত হন, নির্বাচিত কয়েকজন বিচারক নিযুক্ত করে কয়েকটি স্ববিরোধপূর্ণ হাদীস সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে আপনার সামনে উপস্থাপন করা হবে। আপনি যদি আপনার জ্ঞানগত যোগ্যতায় স্ববিরোধ দূর করে দেখিয়ে দেন তাহলে পঁচিশ রুপি পুরস্কারস্বরূপ আপনাকে প্রদান করা হবে এবং আপনার জ্ঞানগত যোগ্যতা স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। আর আপনি যদি চুপ থাকেন, তাহলে আপনার অযোগ্যতা ও অজ্ঞতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু আপনি চুপ থাকলেন।

অতএব, আমি বলছি, বহু জটিল কারণে আপনার মাঝে প্রভূত দ্বীনের জ্ঞান রয়েছে বলে যদিও আপনার দাবি, কিন্তু আপনি খুব ভালভাবে স্মরণ রাখুন, উল্লিখিত পরীক্ষাগুলোতে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সত্যবাদী সাব্যস্ত না হন, ততক্ষণ আপনার এই দাবি অন্তঃসারশূন্য ও প্রমাণবিহীন মাত্র। আর স্মরণ রাখুন, এই পরীক্ষাগুলোতে কখনো আপনি সসম্মানে আপনার শুভ পরিণাম দেখতে পারবেন না। এটাই সেই অহঙ্কারের শাস্তি যা খোদা তা'লা প্রত্যেক অহঙ্কারী ব্যক্তিকে দিয়ে থাকেন। **'ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাখুর'** [অর্থাৎ, কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে আল্লাহ্ আদৌ পছন্দ করেন না।' *(লুকমান: ১৯)*]

আপনার সেই উগ্রতার কারণে আপনার দুই স্ত্রীকে শর্তসাপেক্ষে তালাক দেওয়াটা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে হাসির কারণ হয়েছে। কেননা আপনাকে হাদীস গ্রন্থ 'তালভীহ্'-এর সেই অংশ পড়ে শুনানো হয়েছিল যার উদ্ধৃতিমূলে ঐ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে, 'তালভীহ্' গ্রন্থের প্রণেতা নিজে এর সাক্ষী হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, 'আরযুল হাদীসে আলা মুয়ারিযাতিল কুরআন'–(অর্থাৎ, কুরআনের সাথে সঙ্গতিশীল হলে গ্রহণযোগ্য) এই মাপকাঠিতে হাদীসটি সহীহ্ বুখারীতে মওজুদ রয়েছে। এখন এর মোকাবিলায় আপনার এই ওজর-আপত্তি পেশ করা যে, ভারতবর্ষে বুখারীর যেসব সংস্করণ মূদ্রিত হয়েছে সেগুলোতে এ হাদীসটি মওজুদ নেই– এটা সম্পূর্ণভাবে আপনার নির্বুদ্ধিতা ও বুঝার অক্ষমতা বৈ অন্য কিছু নয়। কেননা 'সীমিত জ্ঞানে কোন বস্তুর অনুপস্থিতি মনে করার দরুন সার্বিকভাবে সেই বস্তুর অনুপস্থিতি সাব্যস্ত হয় না'- নীতি অনুযায়ী গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বক্তব্য নেতিবাচকের চেয়ে শ্রেয়তর বলে স্বীকৃত। তাছাড়াও, মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ সাক্ষ্যের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, ঐ হাদীসটি বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আপনার এ দাবি নেই এবং আপনি দাবী করতেও পারেন না যে, দুনিয়া জুড়ে বুখারী শরীফের সমস্ত সংস্করণ 'হাতে লেখা' হোক বা মূদ্রিত হোক তা আপনি পাঠ করেছেন। এ সত্ত্বেও, কেবল কয়েকটির ওপর ভরসা করে আপনার নির্দোষ স্ত্রীদের তালাক দেওয়াটা যে কত গর্হিত কাজ– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে হাতে লেখা কোন সংস্করণ যদি বেরিয়ে আসে আর সেটিতে এ হাদীসটি মওজুদ থাকে, তাহলে আপনার অবস্থা কী দাঁড়াবে? মু'মিনের সাক্ষ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে এবং রমযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কেবল একজনের সাক্ষ্য দ্বারা সমগ্র জগদ্ব্যাপী মুসলমানদের ওপর (রোযা রাখা) ফরয হয়ে যায়। এমতাবস্থায় 'তালভীহ্' গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা তাফতাযানীর সাক্ষ্য একেবারে নিরস ও বৃথা হতে পারে না। বুখারীর মূদ্রিত সংস্করণগুলোতে যেখানে কতক শব্দের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেখানে সারা দুনিয়া জুড়ে সংস্করণের ব্যাপারে কে নিশ্চয়তা দিতে পারে? কাজেই আপনার প্রমাণবিহীন নেতিবাচক বক্তব্য একেবারে বৃথা। হযরত! গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের বিধানের দিক দিয়ে

ইতিবাচক বর্ণনা নেতিবাচকের চেয়ে অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। কেননা এর মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। অতএব উল্লিখিত সাক্ষ্যের মোকাবিলায় যা শরীয়তের বিধান মতে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা রাখে, আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র যুগের 'হাতে লেখা' সংস্করণসমূহ না দেখাবেন এবং 'তালভীহ্' গ্রন্থের প্রণেতার বক্তব্য মিথ্যা সাব্যস্ত করতে সক্ষম না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভাবনাস্বরূপ উল্লিখিত তালাক কার্যকর হয়েছে। উলামাকে জিজ্ঞেস করে দেখে নিন। সুস্পষ্টত 'তালভীহ্' প্রণেতা (আল্লামা তাফ্‌তাযনী) হাদীসটি প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে যদি মিথ্যাচারী হতেন তাহলে তৎকালীন উপমা কর্তৃক ভর্ৎসনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতেন এবং তাঁর কাছে এর জবাব চাওয়া হত। যেহেতু কোন জবাব তলব করা হয় নি, সেহেতু এ বিষয়ে এটা দ্বিতীয় প্রমাণ যে, প্রকৃতপক্ষে বুখারী শরীফে হাদীসটি প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে তিনি সঠিক ছিলেন। এ ব্যাপারে ঐ যুগের উলামা কর্তৃক সার্বিক নীরবতা প্রদর্শন আরো এক জোরালো প্রমাণ বহন করে যে, বস্তুতপক্ষে 'তালভীহ্' গ্রন্থের প্রণেতা হাদীসটি সহীহ্ বুখারীতে দেখেছিলেন। উল্লিখিত তালাকের মোকাবিলায় আমার ইশতেহার লেখা অনর্থক ছিল। কেননা, এতে কেবল এটুকু প্রমাণিত হবে যে, বিনা কারণে ছিদ্রান্বেষণ করা আপনার একটা অভ্যাস। হযরত! আপনি জানেন, যদিও প্রত্যেকের এখতিয়ার আছে সে তার স্ত্রীকে অবাধ্য, ঔদ্ধত্য, দুর্মুখ বা একেবারে বেমানান হওয়ার কারণে চাইলে তালাক দিতে পারে। এভাবে পয়গম্বরগণও দিয়েছেন। কিন্তু এক ব্যক্তি মানুষে সঙ্গে বাহাস বিতণ্ডায় লিপ্ত আর তখন সে অনর্থক তার অনবহিত সহজ-সরল ও নির্দোষ স্ত্রীদেরকে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তালাক দিল এটা কি হিংস্রতা ও চরম অসভ্যতা নয়? 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে? রসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শে কি এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়? এটাও আপনার মিথ্যাচার যে, আপনি বলেন, আপনি হযরত ইমাম আবু হানিফার অবমাননা করেন নি। কোন বিষয়ে যদি আপনাকে অজ্ঞ বলা হয় তাহলে এ কারণে আপনার রাগ হয় কিন্তু আপনি তো ইমাম সাহেবকে রসূলে করীম (সা.)-এর হাদীস সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ বলে মন্তব্য করেছেন। এটা কি অবমাননা নয়? উভয় ফির্কার উলামা এ বিষয়ে বিচারক বটে। অতঃপর আপনি আপনার ইশতেহারে আমার এই কথাকে মিথ্যাচারের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন যে, ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার বিষয়ে সমস্ত সাহাবা একমত ছিলেন। খোদা তা'লা আপনার অবস্থায় সদয় হোন। ইবনে সাইয়াদ ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তার বক্তব্য থেকে এটা কি প্রতীয়মান নয় যে, সকল সাহাবা তাকে ঐ চিহ্নিত দাজ্জাল বলে অভিহিত করতেন? এ হাদীসটিতে কি এমন কোন সাহাবী আছেন যিনি তাকে দাজ্জাল মনে করতেন না? অথবা এই খবর প্রসিদ্ধি লাভ হওয়ার পর কি কোন সাহাবীর অস্বীকারসূচক বক্তব্য বর্ণিত আছে? আপনার কি জানা নেই যে, ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী 'ইজমা'র একটি প্রকার 'সকূতি' বা নীরবতাবলম্বনমূলক 'ইজমা' নামে অভিহিত? আপনি কি জানেন না যে, হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.) সমীপে কসম খেয়েছিলেন। তখন মহানবী (সা.) নিজে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নি এবং উপস্থিত সাহাবাগণের মাঝেও কেউ তা অস্বীকার করেন নি। এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে বিদ্যমান। আর আপনার এ ওজর-আপত্তি যে, এ শব্দটি মসীহ্-সম্পৃক্ত দাজ্জালের বিশেষ নাম নয় এটা আপনার নির্বুদ্ধিতা ও জ্ঞানস্বল্পতার সম্পর্কে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষ্য। আপনি যদি সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম বা অন্য কোন সহীহ্ হাদীসগ্রন্থ হতে প্রমাণ করে আমাকে দেখিয়ে দেন যে, 'দাজ্জাল' শব্দটি কোন সাহাবী মসীহ্-সম্পৃক্ত দাজ্জাল ছাড়া অন্য কারো ওপর প্রয়োগ করেছেন, তাহলে আমি আপনাকে পঁচিশ রুপি উপহার দেব। আপনি কেন নিজের গোমর ফাঁস করতে চান? নীরব থাকুন। বাস্তবতা আর অজানা নেই, সবই প্রকাশ পেয়েছে। ... *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অব.)

"আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা অনুগ্রহ করে এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহ্‌মদী,**
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-**১২১১**
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

১১ জুন, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়বস্তু:
হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বিগত খুতবায় হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল। এ সম্পর্কে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে কুরায়েশদের মিত্র বনু বকর যখন মুসলমানদের মিত্র বনু খুযাআ'র ওপর আক্রমণ করে আর হুদায়বিয়ার সন্ধির তোয়াক্কা না করে কুরায়েশরা অস্ত্রশস্ত্র এবং বাহন দ্বারা বনু বকরকে সহযোগিতা করে, তখন আবু সুফিয়ান মদিনায় আসে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির নবায়ন করার আগ্রহ ব্যক্ত করে। সে মহানবী (সা.)-এর কাছে যায়, কিন্তু মহানবী (সা.) তার কোন কথার উত্তর দেন নি। এরপর সে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে যায় আর তাঁকে (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি (রা.)ও বলেন, আমি এমনটি করব না। এরপর আবু সুফিয়ান হযরত উমর (রা.)-এর শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর (রা.) সাথে কথা বলে। তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আমি করব মহানবী (সা.)-এর কাছে তোমার (পক্ষে) সুপারিশ! (বরং) খোদার কসম! আমার কাছে খড়কুটাও যদি থাকে, আমি তা দিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে ড. আলী বিন সালাবী লিখেন, মহানবী (সা.) যখন মাররুয্ যাহরান (নামক স্থানে) পৌঁছেন, তখন আবু

সুফিয়ান নিজের সম্পর্কে শঙ্কিত হতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে নাও। হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আবু সুফিয়ানকে বললাম, তুমি ধ্বংস হও, দেখ! মহানবী (সা.) মানুষের মাঝে উপস্থিত আছেন। আবু সুফিয়ান বলে, আমার পিতামাতা তোমার প্রতি উৎসর্গিত, এ থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তিনি তোমাকে গ্রেফতার করেন, তাহলে নিশ্চিতরূপে তোমাকে হত্যা করবেন। আমার পেছনে খচ্চরের পিঠে উঠে বস, আমি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমার জন্য তাঁর কাছে নিরাপত্তা যাচনা করব। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, সে আমার পেছনে বাহনে আরোহন করে। আমি যখনই কোন মুসলিম দলের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পাশ দিয়ে অতিক্রম করতাম, তখন তারা জিজ্ঞেস করত, ইনি কে? অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে জানতে চাইতো, ইনি কে? রাতের বেলা আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। যখনই তারা মহানবী (সা.)-এর খচ্চর দেখতো আর দেখতো যে, আমি সেই খচ্চরে আরোহিত, তখন তারাই বলত, ইনি মহানবী (সা.)-এর চাচা (এবং) তাঁর (সা.) খচ্চরেই আরোহিত। এমনকি আমি যখন উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, ইনি কে? আর তিনি (রা.) আমার পাশে এসে দাঁড়ান। এরপর তিনি (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখামাত্রই বলে উঠেন- আল্লাহ্‌র শত্রু আবু সুফিয়ান! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, যিনি কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই তোমার ওপর (ইসলামকে) বিজয় দান করেছেন। এরপর হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে টেনে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। হযরত উমর (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর (তাঁবুতে) প্রবেশ করেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এর (তথা আবু সুফিয়ানের) শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি একে আশ্রয় দিয়েছি। হযরত উমর (রা.) যখন নিজের কথার ওপর জোর দিতে আরম্ভ করেন তখন আমি বললাম, হে উমর! শান্ত হও। আল্লাহ্‌র কসম! সে যদি বনু আদী গোত্রের সদস্য হলে তাহলে তুমি এমন কথা বলতে না আর তোমার জানা আছে, যে, সে বনু আবদে মানাফ গোত্রের সদস্য। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আব্বাস! থাম, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলে তখন আমি এতটাই আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আমার পিতা খাত্তাবও যদি ঈমান আনত তবুও আমি ততটা আনন্দিত হতাম না। আর আমি জানতাম, খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়ে তোমার ঈমান আনা মহানবী (সা.)-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আব্বাস! আবু সুফিয়ানকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাও এবং কাল সকালে নিয়ে এসো। যাহোক, হযরত আব্বাস (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর মধ্যে এই বাক্য বিনিময় হচ্ছিল। অবশেষে মহানবী (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কেই বলেন, তাকে নিয়ে যাও। আমি নিরাপত্তা দিয়েছি তাই নিয়ে যাও আর তাকে কিছু বলবে না।

আবু বকর বিন আব্দুর রহমান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, ৭ম হিজরীর শাবান মাসে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে ত্রিশজন সৈন্যসহ 'তোরবা' নামক অঞ্চলে 'হাওয়াযেন' গোত্রের একটি শাখার প্রতি এক সারিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন। তোরবা হচ্ছে মক্কা থেকে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি বসতি যেখানে বনু হাওয়াযেন (গোত্র) বসবাস করত। যখন দুই দিন প্রভৃতি দূরত্বের কথা উল্লেখ হয়, তা মূলত প্রাচীন যুগের বাহন যেমন ঘোড়া বা উটের (সফরের) বরাতে উল্লেখ হয়। বুরিদা আসলামী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) যখন খায়বারবাসীর বসবাস স্থলের কাছে শিবির স্থাপন করেন তখন তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর হাতে পতাকা তুলে দেন। দুই দিনের (দূরত্ব) কথার অর্থ হচ্ছে, যখনই দিনের বরাতে কোন বর্ণনা বা ঘটনা আসে সে ক্ষেত্রে। জীবন-চরিতের গ্রন্থসমূহে লেখা আছে, বড় পতাকার উল্লেখ সর্বপ্রথম খায়বারের যুদ্ধে পাওয়া যায়। এর পূর্বে শুধুমাত্র ছোট পতাকা ছিল। আলোচনা চলছিল যে, বুরিদা আসলামী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন খায়বারবাসীর প্রান্তরে অবতরণ করেন তখন তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর হাতে তাঁর পতাকা তুলে দেন। এরপর এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে যে, সর্বপ্রথম খায়বারের যুদ্ধে বড় পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায় আর এর পূর্বে শধুমাত্র ছোট পতাকা হত। মহানবী (সা.)-এর পতাকা ছিল কালো রঙের যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর চাদর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এর নাম ছিল উকাব। তাঁর (সা.) একটি সাদা রঙের পতাকা ছিল যা তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে দিয়েছিলেন। পূর্বে একটি পতাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা কালো রঙের ছিল, যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)'র চাদর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এরপর আরেকটি পতাকার উল্লেখ রয়েছে, যা সাদা রঙের ছিল, তিনি (সা.) তা হযরত আলী (রা.)-কে দিয়েছিলেন। একটি পতাকা তিনি (সা.) হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.)-কে এবং একটি (পতাকা) হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে দিয়েছিলেন। এছাড়া মহানবী (সা.) যখন খায়বারে আগমন করেন তখন তাঁর (সা.) মাথাব্যাথা শুরু হয় ফলে তিনি (সা.) বাহিরে আসতে পারেন নি। তখন তিনি (সা.) প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাঁর পতাকা দেন এরপর সেই একই পতাকা হযরত উমর (রা.)-কে দেন। সেদিন তুমুল যুদ্ধ হলেও মুসলমানরা দুর্গ জয় করতে পারে নি। তখন তিনি (সা.) বলেন, আগামীকাল আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেব যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করবেন।

তদনুযায়ী পরের দিন মহানবী (সা.) সেই পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে তুলে দেন এবং তার (রা.) হাতে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, আমি ইবনে শাহাব যুহরীর কাছে জানতে চাই, মহানবী (সা.) খায়বারের খেজুর বাগানগুলো কোন্ কোন্ শর্তে ইহুদিদের দিয়েছিলেন। যুহরী বলেন, যুদ্ধে মহানবী (সা.) খায়বারে বিজয় লাভ করেন আর খায়বার মালে গনিমতের অংশ ছিল যা মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে দান করেছিলেন। এর পঞ্চমাংশ মহানবী (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল যা তিনি (সা.) মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন এবং ইহুদিদের মধ্যে যারা যুদ্ধের পর দেশান্তরের শর্ত মেনে নিজেদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, মহানবী (সা.) তাদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা যদি চাও তাহলে এসব সম্পদ তোমাদের কাছে এ শর্তে অর্পণ করা যেতে পারে যে, তোমরা এখানে কাজ করবে এবং এর ফল আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বণ্টন হবে। যদি তোমরা এখানে থাকতে চাও তাহলে এ সম্পদ বণ্টনের শর্তে কাজ হয়ে যাবে। আর আমি তোমাদেরকে সেখানেই রাখব যেখানে আল্লাহ্ তোমাদেরকে রাখবেন। ইহুদিরা উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়। ইহুদিরা সেখানে কাজ করতে থাকে। মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.)-কে পাঠাতেন, তিনি ঐসব বাগানের ফল বণ্টন করতেন এবং ইহুদিদের জন্য ফল বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতেন। এমনটি নয় যে, ভাল ফল নিজের জন্য রেখে দিতেন, বরং ন্যায়পরায়ণতার সাথে বণ্টন করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর নবী (সা.)-কে মৃত্যু দান করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)ও ইহুদিদের সাথে তদ্রুপ ব্যবহার জারী রাখেন যেরূপ রসূলুল্লাহ্ (সা.) করতেন। হযরত উমর (রা.)ও তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভে এই ধারাই বহাল রাখেন। অতঃপর হযরত উমর (রা.) জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণের পূর্বে অন্তিম অসুস্থতার সময় বলেছিলেন, আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম একত্রে থাকবে না। হযরত উমর (রা.) এটি যাচাই ও তদন্ত করেন। আর যখন এ বিষয়টি প্রমাণ হয় তখন তিনি খায়বারের ইহুদিদেরকে লিখেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তোমাদের নির্বাসনের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম একত্রে থাকবে না। কাজেই ইহুদিদের মধ্যে যার কাছে মহানবী (সা.)-এর কোন অঙ্গীকারনামা আছে সে যেন তা আমার কাছে নিয়ে আসে, যাতে আমি তার জন্য তা প্রয়োগ করতে পারি। আর যার কাছে মহানবী (সা.)-এর কোন অঙ্গীকারনামা নেই সে যেন দেশান্তরের জন্য প্রস্তুতি নেয়। যদি কেউ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে থাকে, অর্থাৎ মহানবী (সা.) রাখার কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তাহলে ঠিক আছে, আমি তা পূর্ণ করব। কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে তোমাদেরকে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। অতএব যাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর কোন অঙ্গীকারনামা ছিল না, হযরত উমর (রা.) তাদেরকে দেশান্তরিত করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, আমি, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) খায়বারে নিজেদের সম্পত্তি দেখতে যাই এবং সেখানে পৌঁছে আমরা পৃথক হয়ে যার যার সম্পত্তি দেখার জন্য চলে যাই। রাতে আমার ওপর আক্রমণ করা হয় যখন আমি বিছানায় শায়িত ছিলাম। আমার কনুই বাহুজোড়া হতে খুলে যায়। সকালবেলা আমার দু'জন সঙ্গী চিৎকার করে আমার কাছে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, তোমার এ অবস্থা কে করেছে? আমি বলি, আমি জানি না। তিনি (রা.) বলেন, তারা দু'জন মিলে আমার হাত ঠিক করেন। এরপর আমাকে নিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর নিকট আসে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি ইহুদিদের কাজ। অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে লোক সকল! মহানবী (সা.) খায়বারের ইহুদিদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, 'আমরা যখন চাইব তখন তাদরকে বের করে দিব'। এখন যেভাবে তোমরা অবগত হয়েছ যে, ইহুদিরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর-এর ওপর আক্রমণ করেছে এবং তাঁর বাহুজোড়া কনুই হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ইতিপূর্বে আনসারদের ওপরও তারা আক্রমণ করেছিল। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, সে (অর্থাৎ ঘাতক) তাদেরই সঙ্গী। সেখানে তারা ব্যতীত আমাদের আর কোন শত্রু নেই। অতএব, খায়বারে যাদের সম্পত্তি রয়েছে তারা যেন তা বুঝে নেয়, কেননা আমি ইহুদিদের বহিষ্কার করতে যাচ্ছি। আর তিনি (রা.) তাদেরকে বহিষ্কার করে দেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাকনাফ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমর (রা.) ইহুদিদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করেন তখন তিনি স্বয়ং আনসার ও মুহাজেরদের সাথে যাত্রা করেন এবং হযরত জব্বার বিন সাখ্‌র ও হযরত ইয়াযীদ বিন সাবেত-ও তাদের সাথে রওয়ানা হন। হযরত জব্বার মদিনাবাসীর জন্য ফল পরিমাপক ও নিরীক্ষক ছিলেন। তাঁরা দু'জন পূর্বের বণ্টনরীতি অনুযায়ী এর প্রাপ্যদের মাঝে খায়বারের (ফল) বণ্টন করেন। হযরত হাতেব (রা.)-এর বরাতে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি যখন গোপনে মক্কার মুশরিকদের নিকট এক মহিলা মারফত পত্র প্রেরণ করেন, তখন মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে হযরত আলী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে সেই মহিলা ধরা পড়ে। এরপর মহানবী (সা.) যখন হাতেব (রা.)- কে জিজ্ঞেস করেন, তখন হাতেব (রা.) যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং নিজের ঈমান সম্পর্কে বলেন যে, ঈমানের ক্ষেত্রে আমার মাঝে কোন দুর্বলতা বা বিচ্যুতি নেই, বরং আমার পূর্ণ ঈমান রয়েছে। হযরত হাতেব (রা.) যখন নিজের ঈমানের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন তখন মহানবী (সা.)

তা মেনে নেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এই মুনাফেকের শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। তিনি (সা.) বলেন, দেখ! সে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আর তুমি কি জান যে, আল্লাহ্ তা'লা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়ে উঁকি দিয়ে দেখে বলেছেন, 'তোমরা যা চাও কর আমি তোমাদের পাপসমূহকে ঢেকে তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'।

আরেকটি ঘটনা আছে যার সাথে হযরত উমর (রা.)-এর প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্পর্ক না থাকলেও প্রাসঙ্গিকভাবে হযরত উমর (রা.)-এর উল্লেখ দেখা যায়, তাই এই ঘটনাটিও বলে দিচ্ছি। হযরত আবু কাতাদা বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের সময় আমি এক মুসলমানকে দেখলাম, সে কোন এক মুশরিক ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করছিল আর অপর এক মুশরিক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অগোচরে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পেছন থেকে তার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। এটি দেখে আমি দ্রুতগতিতে সেই ব্যক্তির দিকে এগিয়ে যাই যে একজন মুসলমানের ওপর এভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। সে আমাকে হত্যা করার জন্য হাত উঠাতেই আমি তার হাতে কোপ দিয়ে তার হাত কেটে ফেলি কিন্তু সে আমাকে ধরে ফেলে এবং এত শক্তভাবে আমাকে চেপে ধরে যে, আমি নিরুপায় হয়ে যাই। অবশেষে এক সময় সে আমাকে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ সে নিথর হয়ে পড়ে হাতের বাঁধন হালকা হতেই আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করি। এদিকে যা ঘটে তা হল, পরাজয় বরণ করে মুসলমানরা পালিয়ে যায় আর আমিও তাদের সাথে পালিয়ে যাই। তখন আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে কিছু লোকের সাথে উপস্থিত দেখতে পাই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, মানুষের কী হয়েছে যে, তারা পালিয়ে গেছে? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। অতঃপর লোকেরা আবার মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসে। মহানবী (সা.) ঘোষণা করে বলেন, যে ব্যক্তি কোন নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে মর্মে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির সম্পদের অধিকারী হবে হত্যাকারী। আমি আমার হাতে নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য সন্ধানে বের হলাম, কিন্তু আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কাউকেই পেলাম না; আমি আবার বসে পড়লাম। অতঃপর আমার স্মরণ হল, আমি নিহত ব্যক্তির ঘটনা মহানবী (সা.)-এর সমীপে বিবৃত করেছিলাম। তাঁর আশপাশে যারা বসেছিল তাদের একজন বলল, সেই নিহত ব্যক্তির অস্ত্র আমার কাছে আছে যার কথা ইনি বলছেন। তাই আপনি এসব অস্ত্রের পরিবর্তে তাকে অন্য কিছু দিয়ে বুঝিয়ে দিন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এটা কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, তিনি (সা.) কুরায়েশ গোত্রের এক সাধারণ ব্যক্তিকে সামগ্রী দিবেন আর আল্লাহ্‌র সিংহদের এক সিংহকে অবজ্ঞা করবেন, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষে যুদ্ধ করছে। হযরত আবু কাতাদা বলেন, মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে যান এবং আমাকে আমার প্রাপ্য সমগ্রী প্রদান করেন। আমি এর বিনিময়ে ছোট একটি খেজুরের বাগান ক্রয় করি আর ইসলাম গ্রহণের পর এটিই আমার প্রথম সম্পদ যা আমি বানিয়েছি।

হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, আমরা যখন হুনায়েনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি তখন হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এতেকাফে বসা সংক্রান্ত অজ্ঞতার যুগে কৃত তার এক মানতের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। মহানবী (সা.) সেই মানত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, এই মানত অজ্ঞতার যুগে করা হলেও এটি পূর্ণ কর, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে থেকে যা পূর্ণ করা সম্ভব হয়– এই শর্তসাপেক্ষে।

তাবুকের যুদ্ধে হযরত উমর (রা.)-এর ভূমিকা কী ছিল এবং এ সম্পর্কে কী বর্ণনা এসেছে। তাবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যখন চাঁদার এক বিশেষ আহ্বান জানানো হয়, এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) তাঁর নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে সদকা করার আহ্বান জানান। সে সময় আমার কাছে সম্পদ ছিল, আর আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি কোন দিন হযরত আবু বকর (রা.) থেকে অগ্রগামী হতে পারি তবে তা আজই সম্ভব। তখন আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসলাম। তখন মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, নিজ পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? আমি বললাম ততটুকুই রেখে এসেছি যতটুকু এখানে নিয়ে এসেছি। হযরত আবু বকর (রা.) তার কাছে যা ছিল সব নিয়ে আসলেন। আমি তো অর্ধেক নিয়ে এসেছি আর হযরত আবু বকর (রা.) তার নিকট যা কিছু ছিল তার সব নিয়ে এসেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকেও জিজ্ঞেস করেন, নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ? তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে কোন বিষয়ে কখনোই অগ্রগামী থাকতে পারব না। এ ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন–

এক জিহাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার মনে হল, হযরত আবু বকর (রা.) সব সময় আমার চেয়ে এগিয়ে থাকেন। আজ আমি তাঁর থেকে অগ্রগামী থাকব। এ কথা ভেবে আমি ঘরে যাই এবং নিজ সম্পদের অর্ধেক বের করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপনের জন্য নিয়ে আসি। সেই যুগটি ইসলামের জন্য অনেক সংকটের যুগ ছিল কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি নিবেদন করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি শুনে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই আর আমি ভাবলাম, আজ আমি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে হযরত আবু বকরের চেয়ে এগিয়ে

থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আজও আবু বকর আমার চেয়ে এগিয়ে রইলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এক যুগ এমন ছিল যখন মানুষ ঐশীধর্মের জন্য নিজেদের প্রাণ গবাদি পশুর ন্যায় উৎসর্গ করত, সম্পদের কথা বাদই দিলাম। হযরত আবু বকর (রা.) একাধিকবার নিজের সমস্ত বাড়ি ঘর (ধর্মের প্রয়োজনে) উৎসর্গ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটি কেবল একবারের ঘটনা নয় বরং একাধিকবার এমনটি হয়েছে। এমনকি নিজ ঘরে একটি সুঁই পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন নি। একইভাবে হযরত উমর (রা.) নিজের সামর্থ অনুযায়ী এবং হযরত উসমান (রা.) তার শক্তি ও সামর্থানুযায়ী, একইভাবে স্বীয় পদমর্যাদা অনুসারে সব সাহাবী নিজ প্রাণ ও সম্পদ এই ঐশীধর্মের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, কিছু লোক এমন আছে যারা বয়আত করে ঠিকই এবং এই স্বীকারোক্তিও দেয় যে, আমরা ধর্মকে জগতের ওপর প্রাধান্য দিব, কিন্তু সাহায্য সহযোগিতার যখন প্রয়োজন হয় তখন তারা নিজেদের পকেট খুব শক্ত করে চেপে ধরে রাখে। অতএব জগতের প্রতি এতো ভালবাসা থাকলে কি কেউ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে? আর এমন ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব কি কখনো নবুয়তের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হতে পারে? না; কখনোই না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

(সূরা আলে ইমরান: ৯৩)

অর্থাৎ, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করবে ততক্ষণ তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।

মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন হযরত উমর (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল– এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন ঘরে কয়েকজন পুরুষ সদস্য উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আসো! আমি তোমাদেরকে একটি ওসিয়্যত লিখিয়ে দেই যার ফলে তোমরা আর বিভ্রান্তিতে পড়বে না। এটি মহানবী (সা.)-এর (অসুস্থতার) অন্তিম মুহূর্তের কথা। মহানবী (সা.)-এর একথা শুনে হযরত উমর (রা.) চারপাশে উপবিষ্ট লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভীষণ অসুস্থ; তাছাড়া তোমাদের নিকট কুরআন রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার কিতাবই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। বাড়িতে উপস্থিত লোকেরা মতভেদ করে ও বাকবিতণ্ডা আরম্ভ করে দেয় এবং এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ বলতে থাকে, কাগজ-কলম নিয়ে এসো, যাতে করে মহানবী (সা.) এমন ওসীয়্যতনামা লিখিয়ে দিতে পারেন যার ফলে তোমরা আর বিভ্রান্তিতে পড়বে না আবার কয়েকজন হযরত উমর (রা.)-এর সাথে একমত পোষণ করে বলছিল যে, মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিও না। অতঃপর তারা যখন মহানবী (সা.)-এর পাশে বসে অনেক কথাবার্তা আরম্ভ করে দিল, অর্থাৎ বিতর্ক আরম্ভ হয়ে গেল এবং পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিল। তখন তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

এটি মুসলিম শরীফের হাদীস, যার বিবরণ কিছুটা বিস্তারিত বুখারীতেও এসেছে। সেখানে হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বলেন, মহানবী (সা.) যখন মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, লেখার কোন জিনিস নিয়ে আস যেন আমি তোমাদেরকে এমন কিছু লিখিয়ে দিতে পারি যার পর তোমরা আর বিভ্রান্ত হবে না। হযরত উমর (রা.) তখন আশপাশের লোকদের বলেন, মহানবী (সা.)-এর ওপর রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে আর আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব অর্থাৎ কুরআন রয়েছে যা আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাই মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তখন তারা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয় এবং অনেক শোরগোল হতে থাকে। মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, ওঠ আর আমার কাছ থেকে চলে যাও। আমার কাছে বসে ঝগড়া করা শোভনীয় নয়। এরপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বাইরে চলে যান। তিনি (রা.) বলতেন, সবচেয়ে বড় ক্ষতি যা হয়েছে তা হল, মহানবী (সা.)-কে লেখার সুযোগ করে দেয়া হয় নি।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ সাহেব এই হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তার কিছুটা তুলে ধরছি। তিনি বলেন, 'লা তাযিল্লু বা'দাহু'-হাদীসের এই অংশ স্পষ্ট করেছে যে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও মহানবী (সা.) এটি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, 'লা তাযিল্লু বা'দাহু' অর্থাৎ, তোমরা যাতে এরপর ভুলে না যাও তাই ওসীয়্যত লিখে দেই। 'যালাল' শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়াও হয়ে থাকে, ভুল করে অন্য পথে চলে যাওয়াও বুঝায়। 'গালাবাহুল ওয়াজ'উ' অর্থাৎ রোগ মহানবী (সা.)-কে অবসন্ন করে দিয়েছে, পাছে তাঁর (সা.) কষ্ট বেড়ে যায়; এটি হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি। শাহ সাহেব লিখেন, হযরত উমর (রা.) কখনো ভাবতেও পারতেন না যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করবেন। হযরত উমর (রা.) যে 'ইনদানা কিতাবুল্লাহি ওয়া হাসবুনা' কথাটি বলেছিলেন– এর কারণ হল, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ । অতঃপর সূরা আনআমে বলেন, تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ এই কিতাব প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট করে বর্ণনা করে আর আমরা এতে কোনত্রুটি বা ঘাটতি রাখি নি। তারপর তিনি লেখেন, 'লা ইয়ামবাগি ইনদাত্ তানাযু'। হযরত উমর (রা.)-এর মতো যাদের আবেগ-অনুভূতি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিল তারা বলেন, এমন অন্তিম মুহূর্তে তাঁকে (সা.) কষ্ট দেয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলেন, মহানবী (সা.)-এর আদেশ মান্য করা উচিত, তাই তাঁর (সা.)

কথা অনুযায়ী কাগজ-কলম ও দোয়াত নিয়ে আসো, কিন্তু তারা যখন বাদানুবাদে লিপ্ত হন তখন তিনি (সা.) তাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বলেন, আমার কাছে বসে শোরগোল করো না। এ থেকে বুঝা যায়, এমন ব্যাকুলতার মাঝেও মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র কিতাবের মর্যাদার প্রতি এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর একথা শোনার পর তিনি (সা.) আর কখনো কাগজ-কলম কিংবা দোয়াত আনানোর কথা পুনরাবৃত্তি করেন নি। যেমন বুখারী শরীফের অন্যান্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, এ ঘটনার পরও মহানবী (সা.) কিছুদিন জীবিত ছিলেন এবং সে দিনগুলোতে অন্য কিছু ওসিয়্যতও করেছিলেন কিন্তু একথার পুনরাবৃত্তি করেন নি, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বলেন নি। এমন মনে হয় যেন যেসব বিধিনিষেধ লেখানোর প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেগুলো আল্লাহ্‌র কিতাবেই রয়েছে। মনে হয় তিনি পবিত্র কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জোরালো নির্দেশ দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর সমর্থন করেন এবং নীরব থাকেন। এ হল সেই শিষ্টাচার যার প্রতি নামসর্বস্ব আলেমরা ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা কোন একটি মতামত প্রকাশ করলে সেটিকে খোদার ওহীর মতো মনে করে। শাহ্ সাহেব লিখেন, মহানবী (সা.)-এর যে পবিত্র আদর্শ আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় তা হল, আল্লাহ্‌র কিতাবের সামনে অন্য সকল বিষয় এমন হওয়া উচিত যেন সেগুলোর অস্তিত্বই নেই।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) সুনা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সুনাও মদিনা হতে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। ইসমাঈল বলেন, অর্থাৎ শহরতলিতে ছিলেন। এ সংবাদ, অর্থাৎ মৃত্যুর সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন। হযরত উমর (রা.) শহরতলিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে এ বিষয়েরই উদ্রেক হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্য অবশ্যই তাঁকে উঠাবেন যাতে তিনি (সা.) কোন কোন লোকের হাত-পা কাঁটতে পারেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) এসে পড়েন। হযরত উমর (রা.) এটি মানার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি (সা.) পুনরায় জীবিত হবেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) আসেন, তিনি (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে চুমু খান, এরপর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায় পূতঃপবিত্র। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে কখনোই দু'টি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবেন না। একথা বলেই হযরত আবু বকর (রা.) বাহিরে চলে আসেন, অর্থাৎ মানুষের মাঝে যান এবং বলেন, হে শপথকারী থাম! অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে কসমকারী থাম! হযরত আবু বকর (রা.) কথা বলা শুরু করলে হযরত উমর (রা.) বসে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন,

الافمَن كانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ مُحَمَّدًا قدْ مَاتَ، ومَن كانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فإنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يَمُوتُ

অর্থাৎ শোন! যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর উপাসনা করতে তারা শুনে নাও, মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেছেন আর যারা আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে তারা শুনে নাও, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এ আয়াত পাঠ করেন, *(সূরা আয যুমার: ৩১)* إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

অর্থাৎ তুমিও মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এরপর তিনি (রা.) এ আয়াত পড়েন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)

অর্থাৎ মুহাম্মদ কেবল আল্লাহ্‌র একজন রসূলমাত্র আর তাঁর পূর্বের সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে। আর যে-ই তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতিই করতে পারবে না; আর অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিদান দিবেন। সোলায়মান বলতেন, একথা শোনার পর মানুষ এত কাঁদে যে, তাদের হেঁচকি উঠে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এমন মনে হচ্ছিল যেন হযরত আবু বকর (রা.) সেই আয়াতটি পাঠ করার পূর্বে মানুষ জানতই না যে, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতটিও অবতীর্ণ করেছেন। মনে হচ্ছিল যেন সবাই তার কাছ থেকে এ আয়াতটি শিখেছে। এরপর যাকেই আমি শুনেছি, সে এ আয়াতই পাঠ করছিল। যুহ্‌রী বলতেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব আমাকে বলেছেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যখনই আমি আবু বকর (রা.)-কে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনেছি তখনই আমি এতটাই ত্রস্ত হয়ে যাই যে, ভীতির কারণে আমার দাঁড়ানোর শক্তি পর্যন্ত লোপ পায় আর আমি মাটিতে পড়ে যাই। হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ আয়াত পড়তে শুনে আমি বুঝতে পারি যে, মহানবী (স.) মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, হাদীসের আরবী শব্দাবলীও তিনি উদ্ধৃত করেছেন, আমি এখানে সেটির অনুবাদ পড়ে দিচ্ছি। ছাপানোর সময় মূল

আরবী শব্দগুলো যুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর দিন বের হন। হযরত উমর (রা.) মানুষের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) মারা যান নি, বরং জীবিত আছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে উমর! বসে পড়। কিন্তু উমর (রা.) বসতে অস্বীকৃতি জানান। মানুষ তখন উমরকে ছেড়ে আবু বকরের প্রতি মনোযোগী হয় আর আবু বকর (রা.) আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বলেন, শুনে নাও! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর উপাসনা করে তার জানা উচিত, মুহাম্মদ (সা.) মারা গেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যে খোদার ইবাদত করে তার স্মরণ রাখা উচিত, খোদা চিরঞ্জীব, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ হচ্ছে খোদা বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) কেবল একজন রসূল। তার পূর্বের সকল রসূল এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, অর্থাৎ মারা গেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) الشَّاكِرِينَ পর্যন্ত এ আয়াতটি পাঠ করে শুনান। এরপর তিনি লিখেন, বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, খোদার কসম! লোকেরা যেন এ বিষয়টি জানতই না যে, খোদা তা'লা এ আয়াতও নাযিল করেছেন আর আবু বকর (রা.)-এর পাঠ করার ফলে তারা তা জানতে পেরেছে। অতএব এ আয়াতটি সকল সাহাবী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছ থেকে শুনে আত্মস্থ করে আর সাহাবী ও সাহাবী নয় এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে এই আয়াতটি পাঠ করছিল না। হযরত উমর (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি এ আয়াতটি কেবল আবু বকরের কাছ থেকেই শুনেছি যখন তিনি তা পাঠ করেছেন। অতএব, আমি তাঁর কাছ থেকে শোনার পর এমনভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি হারিয়ে ফেলি ও মর্মাহত হই যে, আমার পা আমার ভর বহনে অক্ষম ছিল। আমি যখন এ আয়াত পাঠ করতে শুনি এবং একথা বলতে শুনি যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তখনই মাটিতে পড়ে যাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ইমাম কস্তুলানী বুখারীর ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে লিখেন যে, 'উমারাবনু লখাত্তাবে ইউকাল্লিমুন্নাসা ইয়া কুলুলাহুম মামা'তা রসূলুল্লাহ্, ওয়া লা ইয়ামুতু হাত্তা ইয়াকতুলুল মুনাফিকীন' অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) মানুষের সাথে কথা বলছিলেন এবং বলছিলেন যে, মহানবী (স.) মারা যান নি আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুনাফেকদের হত্যা না করবেন তিনি মারা যাবেন না। এরপর তিনি বলেন, 'মিলাল ওয়ান্ নেহাল শাহ্‌রেস্তানী'-তে এ ঘটনা সম্পর্কে যে বাক্যগুলো রয়েছে সেগুলোর অনুবাদ হচ্ছে,

উমর খাত্তাব বলতেন, যে ব্যক্তি বলবে, মুহাম্মদ (সা.) মারা গেছেন আমি আমার এ তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করব; বরং তাঁকে (সা.) ঈসা ইবনে মরিয়মের মতো আকাশে উঠানো হয়েছে। তখন আবু বকর বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করে, সে জেনে নিক নিশ্চয় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদার ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক যে, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরবেন না, অর্থাৎ চিরঞ্জীব হওয়া একমাত্র খোদারই বৈশিষ্ট্য। বাকি সকল মানুষ ও জীবজন্তু তাদের সম্পর্কে চিরস্থায়ী হবার ধারণা করার পূর্বেই মারা যায়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এ আয়াতটি পাঠ করেন যার অনুবাদ হল, মুহাম্মদ (সা.) একজন রসূল, তার পূর্বের সকল রসূল গত হয়েছেন। অতএব, তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। তখন লোকেরা এ আয়াত শুনে তাদের ভুল ধারণা পরিত্যাগ করে। এখন চিন্তা করে দেখ, এটি যদি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কুরআন থেকে এ মর্মে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন গণ্য না হয় যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন আর একইভাবে এ প্রমাণ যদি সঠিক, সুস্পষ্টও অকাট্য না হত, তাহলে তাঁর উক্তি অনুসারে লক্ষাধিক সাহাবী; অর্থাৎ হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এখানে যুক্তি প্রদান করেন আর সম্বোধিত ব্যক্তিকে বলেন, তাঁর উক্তি অনুসারে লক্ষাধিক সাহাবী কীভাবে কাল্পনিক ও সন্দেহপূর্ণ কোন বিষয়কে মেনে নেন এবং কেন তারা এই যুক্তি উপস্থাপন করেন নি যে, হে মহোদয়! আপনার এই দলিল অসম্পূর্ণ আর আপনার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। আপনি কি এখনও জানেন না যে, কুরআনের আয়াত بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ হযরত মসীহ্‌র সশরীরে আকাশে যাওয়ার কথা বলে? بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ আয়াত কি আপনি শুনেন নি? তাহলে মহানবী (সা.)-এর আকাশে যাওয়া আপনার দৃষ্টিতে অসম্ভব কেন? বরং কুরআনের মর্ম সম্পর্কে অবগত সাহাবীরা আয়াতটি শুনে এবং خَلَتْ শব্দের ব্যাখ্যা أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ বাক্যে পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে নিজস্ব চিন্তাধারা পরিত্যাগ করেন। তবে একথা সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে তাদের মন ভেঙে যায় এবং হৃদয় ভীষণ মর্মাহত হয় ও তাঁদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় আর হযরত উমর (রা.) বলেন, এ আয়াতটি শোনার পর আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আমার পা আমার শরীরের ভার বহনে অক্ষম হয়ে যায় আর আমি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হই।

সুবহানাল্লাহ্! তারা কেমন পুণ্যবান এবং কুরআনের কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যখনই তারা আয়াতে মনোনিবেশ করে বুঝতে পেরেছেন যে, বিগত সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন ও চরমভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হন।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরেক স্থানে বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর একথা বলা যে, যে ব্যক্তি সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সম্পর্কে একথা বলবে যে, তিনি মারা গেছেন তাকে আমি আমার এ তরবারি দিয়ে হত্যা করব– এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত উমর (রা.) নিজের এ ধারণার কারণে মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে অলীক ধারণা রাখতেন আর মহানবী (সা.) মারা গেছেন–মর্মে বাক্যটিকে তিনি কুফর ও ধর্মত্যাগের নামান্তর মনে করতেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সহস্র সহস্র উত্তম প্রতিদান দিন, কেননা শীঘ্রই তিনি সেই ফিতনার নিরসন করেছেন এবং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, বিগত সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন।

যেভাবে তিনি মুসায়লামা কায্যাব ও আসওয়াদ আনসীগণদের হত্যা করেছেন একইভাবে এই ব্যাখ্যার মাধ্যমেও বক্র যুগের অনেক মিথ্যাবাদীকে সাহাবীদের ইজমা তথা ঐক্যমতের মাধ্যমে হত্যা করেছেন। অর্থাৎ যেভাবে তাদের হত্যা করেছেন অনুরূপভাবে ভ্রান্ত চিন্তাধারারও অবসান ঘটিয়েছেন। এভাবে তিনি চার মিথ্যাবাদী নয় বরং পাঁচ মিথ্যাবাদীকে হত্যা করেছেন। এরপর তিনি (আ.) বলেন, হে খোদা! তার প্রতি কোটি কোটি রহমতবারি বর্ষণ করুন। এখানে যদি خَلَتْ শব্দের এ অর্থ করা হয় যে, কোন কোন নবী জীবিত অবস্থায় আকাশে গিয়ে বসে আছেন তাহলে তো এ ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাব্যস্ত হন এবং এ আয়াত তার বিরোধী নয়, বরং সমর্থক প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ আয়াতের পরবর্তী বাক্য, যা ব্যাখ্যাস্বরূপ অর্থাৎ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ , যার প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, তা বলছে যে, সকল নবী অতীত হয়ে গেছেন। মৃত্যু বরণে অতীত হোন বা জীবিত অবস্থায়– আয়াতের এ অর্থ করা এক প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, প্রক্ষেপণ এবং খোদার ইচ্ছার বিপরীতে এক জঘন্য মিথ্যারোপ। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন মিথ্যাচারকারী ব্যক্তি, যে বিচার দিবসকে ভয় করে না এবং খোদার নিজস্ব ব্যাখ্যার বিপরীত উল্টো অর্থ করে, সে নিঃসন্দেহে স্থায়ীভাবে অভিশপ্ত হবে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত এ আয়াত সম্পর্কে জানতেন না এবং অন্য কতিপয় সাহাবীও এমন ভ্রান্ত ধারণায় নিপতিত ছিলেন আর সেই ভুলভ্রান্তির শিকার ছিলেন যা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক দাবি। তারা বিশ্বাস করতেন যে, কোন কোন নবী এখনও জীবিত এবং পরবর্তীতে তারা পৃথিবীতে আসবেন। অতএব কেন মহানবী (সা.) তাদের মতো হবেন না? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এই পুরো আয়াত পড়ে এবং أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ শুনিয়ে সবার মনে একথা গেঁথে দেন যে خَلَتْ শব্দটি দু'টি অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; হয় 'হাতফে আন্‌ফ'-এর মাধ্যমে মৃত্যু, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ, অথবা নিহত হওয়া। তখন ভিন্নমত পোষণকারীরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে এবং সকল সাহাবী এই বিষয়ে একমত হন যে, অতীতের নবীগণ সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ শব্দাবলীর গভীর প্রভাব পড়ে এবং সবাই নিজেদের বিপরীতধর্মী অভিমত পরিত্যাগ করে। ফালহামদুলিল্লাহ্ আলা যালিক [অতএব এ বিষয়ে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র-ই।]

এই কথাগুলো তিনি (আ.) 'তোহফায়ে গযনভিয়া' পুস্তকে বর্ণনা করেন। পুনরায় অপর এক স্থানে তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময়ই সকল সাহাবী এই সাক্ষ্য দেন যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। হযরত উমর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি এখনও মৃত্যুবরণ করেন নি, আর তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে যান; কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক দাঁড়িয়ে এই বক্তৃতা দেন যে, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ উক্ত পরিস্থিতিতে, যা কিনা কেয়ামতের ময়দানের মতোই এক পরিস্থিতি ছিল, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং সাহাবীরা সবাই সমবেত, এমনকি উসামার বাহিনীও তখন পর্যন্ত যাত্রা করে নি; হযরত উমরের কথা শুনে হযরত আবু বকর উচ্চস্বরে বলেন, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ আয়াতটি উপস্থাপন করেন। যদি সাহাবীরা ঘুণাক্ষরেও হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত মনে করতেন তবে তারা অবশ্যই সরব হতেন, কিন্তু সবাই নিশ্চুপ হয়ে যান। বাজারে-বন্দরে সবাই এই আয়াতটিই পড়ছিলেন এবং বলছিলেন, এই আয়াতটি যেন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। সাহাবীরা তো নাঊযুবিল্লাহ্ মুনাফিক ছিলেন না যে, তারা হযরত আবু বকরের ভয়ে নিশ্চুপ থাকবেন এবং হযরত আবু বকরের যুক্তি খণ্ডন করবেন না। কক্ষনো না! প্রকৃত বিষয় তা-ই ছিল যা হযরত আবু বকর বর্ণনা করেন, এজন্যই সবাই মাথা নত করেন। এটিই সাহাবীদের ইজমা। হযরত উমরও এটিই বলছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবার আসবেন। যদি এটি যুক্তি হিসেবে অকাট্য না হত; আর অকাট্য তখনই হওয়া সম্ভব যদি কোন রকম ব্যতিক্রম না থাকে, কেননা যদি হযরত ঈসা জীবিত আকাশে গিয়ে থাকেন আর তার পুনরায় আসার হত, তাহলে এটি যুক্তি নয় বরং ঠাট্টার নামান্তর হত; স্বয়ং হযরত উমর-ই তা প্রত্যাখ্যান করতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারংবার এই বিষয়টিকে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, যেভাবে আমি বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করলাম; তা তিনি এজন্য করেছেন যে, যারা হযরত ঈসাকে আকাশে জীবিত বসে আছেন বলে মনে করে, তাদের মাথা থেকে এই (ভ্রান্ত) ধারণা যেন বের হয়ে যায়। কোন মানুষই জীবিত আকাশে যায় নি আর যেতে পারেও না; তেমনিভাবেই হযরত ঈসা (আ.)-ও মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমরের খিলাফতকালে একবার আমি তার সাথে যাচ্ছিলাম; তিনি ব্যক্তিগত কোন কাজে যাচ্ছিলেন। তার হাতে চাবুক ছিল এবং আমি ছাড়া তার সাথে আর কেউ ছিল না। তিনি স্বগতোক্তি করছিলেন এবং নিজের পায়ের পেছন দিকে চাবুক দিয়ে আঘাত করছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন, হে ইবনে আব্বাস, তুমি কি জান, যেদিন হুযূর (সা.)-এর মৃত্যু হয় সেদিন আমি কেন বলেছিলাম যে, হুযূর (সা.)-এর মৃত্যু হয় নি, আর যে বলবে তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাকে আমি তলোয়ার দিয়ে হত্যা করব? হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি জানি না, আপনিই ভাল জানবেন। হযরত উমর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এর কারণ শুধু এটিই ছিল যে, আমি আয়াত–

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(সূরা আল বাকারা: ১৪৪) পড়তাম। অর্থাৎ এভাবেই আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা মানবজাতির ওপর তত্ত্বাবধায়ক হও এবং রসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক হন। আর

আল্লাহ্‌র কসম, আমি মনে করতাম যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ উম্মতের মধ্যে জীবিত থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হবেন। অতএব, এ কারণেই সেদিন আমি উক্ত কথা বলেছিলাম।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত সম্পর্কে বুখারীতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, পূর্বেও তা বর্ণিত হয়েছে, (এখানে) আমি পুনরায় উল্লেখ করছি। আনসাররা বনী সায়েদা'র বাড়িতে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর কাছে সমবেত হয় আর বলছিল যে, একজন আমীর আমাদের মধ্য হতে আরেকজন তোমাদের মধ্য হতে হোক। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) তাদের কাছে যান। হযরত উমর (রা.) কিছু বলতে চাইলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে থামিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম তার কারণ হল, আমি এমন এক বক্তব্য প্রস্তুত করেছিলাম যা আমার খুবই পছন্দের ছিল। আমার আশঙ্কা ছিল, আবু বকর (রা.) হয়ত ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না অর্থাৎ সেভাবে আমার মতো করে বলতে পারবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বক্তৃতা প্রদান করেন আর এমন বক্তৃতা করেন যা বাগ্মিতার নিরিখে সবার বক্তৃতার শীর্ষে ছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমরা আমীর আর তোমরা সাহায্যকারী, অর্থাৎ আনসারদের একথা বলেন। হুব্বাব বিন মুনযের এ কথা শুনে বলেন, কোন ক্রমেই নয়। আল্লাহ্‌র কসম! আদৌ নয়। খোদার কসম! আমরা এমনটি করবো না। একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবে আরেকজন আমীর আপনাদের মধ্য থেকে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না; বরং আমরা আমীর আর তোমরা উযির বা সাহায্যকারী। কেননা এই কুরায়েশরা বংশের দিক থেকে সমগ্র আরবের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত আর খান্দানের নিরিখে সবচেয়ে প্রাচীন আরব, তাই উমর অথবা আবু উবায়দা'র হাতে বয়আত কর। হযরত উমর (রা.) আবু বকর (রা.)-কে বলেন, না; বরং আমরা তো আপনার হাতে বয়আত করব, কেননা আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের মাঝে সর্বোত্তম আর মহানবী (সা.)-এর কাছে আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়। একথা বলে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাত ধরেন এবং তাঁর কাছে বয়আত করেন আর অন্যরাও তাঁর হাতে বয়আত করে। হযরত উমর (রা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাত ধরে ফেলেন আর বলেন, (আপনি) আমাদের বয়আত নিন আর একই সাথে হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেও ফেলেন এবং নিবেদন করেন যে, হে আবু বকর (রা.)! মহানবী (সা.) আপনাকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, অতএব আপনিই আল্লাহ্‌র খলীফা। আপনার হাতে আমাদের বয়আত করার কারণ হল, আপনি আমাদের চেয়ে মহানবী (সা.)-এর অধিক প্রিয়।

মুরতাদদের ফিতনা বা নৈরাজ্য সম্পর্কে সীরাত ইবনে হিশামে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) যখন মারা যান তখন মুসলমানদের বিপদাবলী বৃদ্ধি পায়। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাতে আমার কাছে সেই রেওয়ায়েত পৌঁছেছে (যাতে) তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আরব মুরতাদ হয়ে যায় আর ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মাথাচাড়া দেয় এবং কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায়। এটি ইবনে ইসহাকের কথা। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যখন ইন্তেকাল হয় এবং তাঁর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হন আর আরবদের মধ্য থেকে যার অস্বীকার করার সে অস্বীকার করে, তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আপনি মানুষের সাথে কীভাবে লড়াই করবেন, যখন কিনা মহানবী (সা.) বলেছেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তাদের সাথে লড়াই বা যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে! অর্থাৎ যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্বীকারোক্তি দিয়েছে তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ঘোষণা দিবে সে আমার হাত থেকে স্বীয় প্রাণও সম্পদ রক্ষা করবে, তবে কোন বৈধ কারণ থাকলে ভিন্ন কথা আর তার হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র হাতে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! নামায ও যাকাতের মধ্যে যে-ই পার্থক্য করবে আমি তার সাথে লড়াই করব, কেননা সম্পদের ওপর যাকাত প্রদেয়। আর আল্লাহ্‌র কসম! তারা যদি আমাকে (উটের) হাঁটু বাঁধার একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা মহানবী (সা.)-কে দিতো তাহলে তা না দেওয়ার কারণেও (আমি) তাদের সাথে লড়াই করব। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এরপর আমি দেখি যে, লড়াইয়ের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বক্ষ উন্মোচিত করেন–তখন আমি অনুধাবন করি যে, এটিই সত্য।

হযরত উসামা বিন যায়েদ এর বাহিনী যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামাকে কিছু নির্দেশনা দান করেন। হযরত উসামা আরোহিত ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) তার সাথে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হযরত উসামা অনুরোধ করেন যে, আপনি বাহনে আরোহন করুন, নতুবা আমিও বাহন থেকে নেমে যাব। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি নামবে না আর খোদার কসম, আমি আরোহন করব না। তিনি আরো বলেন, আর আমার কী হয়েছে যে, আমি আমার পা কিছুক্ষণ আল্লাহ্‌র পথে ধূলামলিন করব না! কেননা গাজীর নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিদানে সাতশত পুণ্য লেখা হয় আর তার পদমর্যাদা সাতশতগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার সাতশত অপরাধ ক্ষমা করা হয়। নির্দেশনা দেয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামাকে বলেন, তুমি যদি সমীচীন মনে

কর তাহলে উমরের মাধ্যমে আমার সাহায্য কর। অর্থাৎ তিনি হযরত উসামার কাছে হযরত উমরকে তার কাছে রেখে যাওয়ার অনুমতি চান, কেননা মহানবী (সা.) হযরত উমরকে সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তখন হযরত উসামা তাকে উক্ত অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফেয শাহাদত বরণ করেন– এ সম্পর্কে হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী রেওয়ায়েত করেন যে, ইয়ামামার লোকদের যখন শহীদ করা হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠান আর সেই সময় তার কাছে ছিলেন হযরত উমর (রা.)। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, উমর আমার কাছে এসেছেন আর তিনি বলেছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু মানুষ শহীদ হয়েছে। আমার আশঙ্কা হল, অন্যান্য যুদ্ধেও ক্বারীরা নিহত হতে পারেন। এভাবে কুরআনের অনেক অংশ নষ্ট হয়ে যাবে, যদি না তুমি কুরআনকে একস্থানে একত্রিত কর। আর আমার মত হল, আপনি কুরআনকে একস্থানে একত্রিত করুন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি উমরকে বলি, আমি এমন কাজ কীভাবে করতে পারি যা মহানবী (সা.) করেন নি! উমর বলেন, খোদার কসম, আপনার এই কাজটি শুভ হবে। উমর আমাকে বারবার এটিই বলতে থাকেন, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন আর এখন আমিও তা সমীচীন মনে করি যা উমর সমীচীন মনে করেছেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেন, তখন হযরত উমর (রা.) সেখানে বসা ছিলেন এবং নিশ্চুপ ছিলেন, কথা বলছিলেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি যুবক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর আমরা তোমার বিষয়ে কোন কুধারণা করি না। তুমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওহী লিপিবদ্ধ করতে। তাই যেখানে যেখানে কুরআন আছে সন্ধান কর। আর এরপর সেগুলো নিয়ে একস্থানে একত্রিত কর। হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেন, আল্লাহ্র কসম, যদি তিনি পাহাড়গুলোর মধ্য থেকে কোন একটি পাহাড়কে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন তাহলেও আমার জন্য সেই কাজ ততটা কঠিন হত না যতটা কিনা এই কাজ, যা করার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন সংকলিত করা। আমি বললাম, আপনারা উভয়ে সেই কাজ কীভাবে করতে পারেন যা মহানবী (সা.) করেন নি! হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, খোদার কসম, এটি ভাল কাজ। আমি তাকে বারবার বলতে থাকি, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য আমার বক্ষও উন্মুক্ত করে দেন যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমি দণ্ডায়মান হই এবং পবিত্র কুরআনের অনুসন্ধান করতে থাকি। সেটিকে চামড়ার টুকরো, কাঁধের হাড়, খেজুরের শাখা এবং মানুষের বক্ষ থেকে একত্রিত করতে থাকি। এমনকি আমি সূরা তওবার দুটি আয়াত হযরত হুযায়মা আনসারীর কাছে পাই, যেগুলো তিনি ছাড়া আর কারো কাছে পাই নি। আর সেগুলো হল:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

(সূরা তওবা: ১২৮)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদেরই মাঝ থেকে একজন রসূল এসেছেন। তোমাদের কষ্ট পাওয়া তার কাছে অসহনীয় আর তিনি তোমাদের মঙ্গলের লোভ রাখেন, মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত ও বারবার কৃপাকারী। এখানে শুধু একটি আয়াতের উল্লেখ রয়েছে, হাদীসে যদিও দুটি আয়াত লেখা আছে। হয়ত পরের আয়াতও থাকবে।

এরপর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যেসব পৃষ্ঠায় পবিত্র কুরআন একত্রিত করা হয়েছিল সেগুলো হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছে থাকে, এরপর হযরত উমর (রা.)-এর কাছে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা তাকেও মৃত্যু দেন। এরপর হযরত হাফসা বিনতে উমর এর কাছে থাকে। পরবর্তীতে তার কাছ থেকেও, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উসমান তা নিয়ে নিয়েছিলেন।

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

৩১ জুলাই, ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে
অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর

ঈদুল আযহার খুতবা

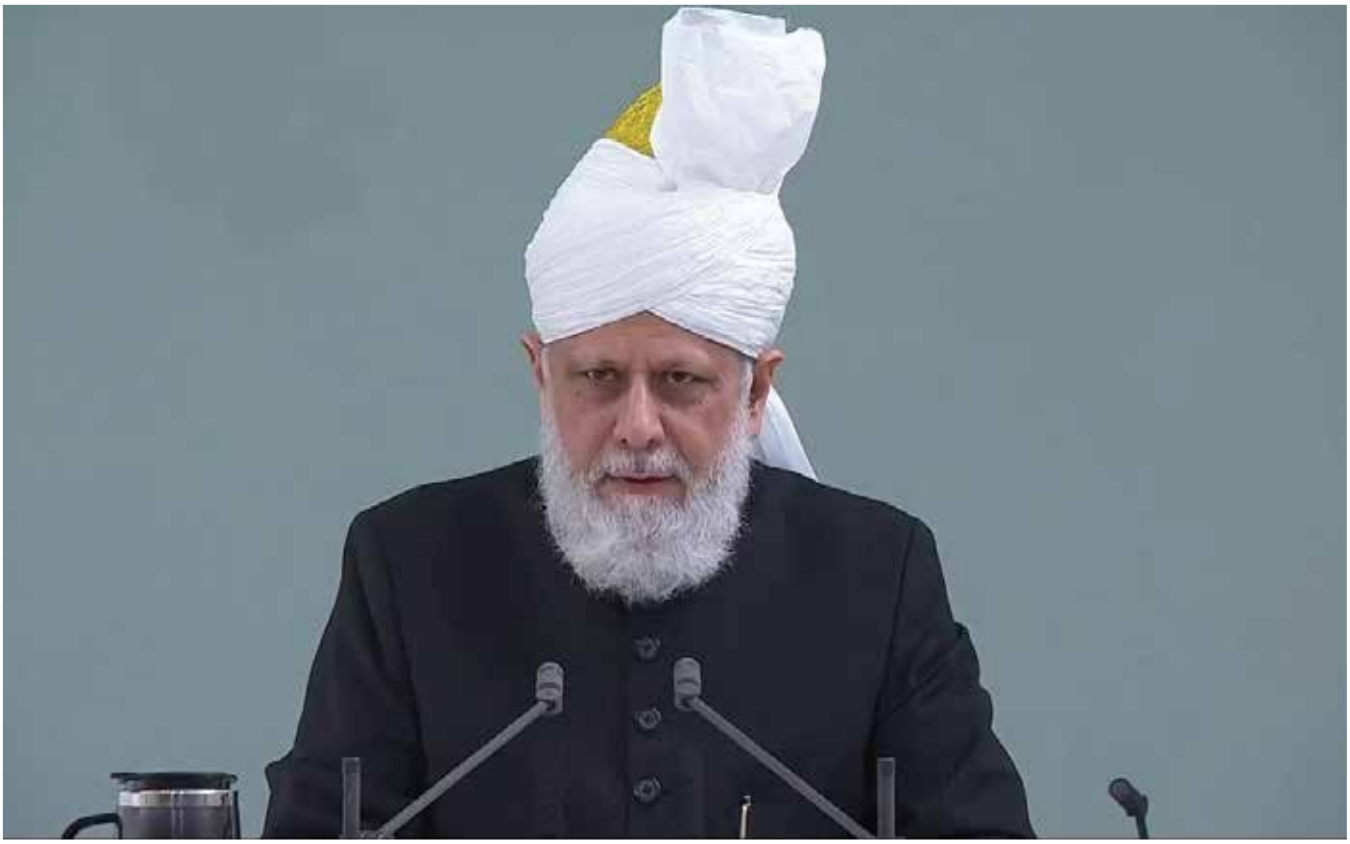

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ ঈদুল আযহা। এ হল সেই ঈদ যাকে কুরবানীর ঈদ বলা হয়। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা খুব আগ্রহের সাথে এই ঈদ উদ্‌যাপন করছে। সময়ের পার্থক্য থাকার কারণে অনেক জায়গায় আগামীকাল ঈদ উদ্‌যাপন করা হবে। এই কুরবানীর বিষয়টি হৃদয়ে সদা জাগরূক রাখার জন্য অথবা সেই ঘটনা হৃদয়ে জাগরূক রাখার জন্য যা চার হাজার বছরের অধিক পূর্বে ঘটেছিল, মুসলমান প্রাথমিক যুগ থেকে এই কুরবানীর ঈদ উদ্‌যাপন করে আসছে। এত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক মু'মিনের হৃদয়ে এই কুরবানীর গুরুত্ব এবং সেই ঘটনা স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ ঘাটতি হয় নি। তবে এ কথা সত্য, এমন অগণিত লোক থাকবে যারা কেবল একটি আনন্দ অনুষ্ঠান হিসেবে এই ঈদ স্মরণ রাখে, এমনকি এই ঈদের জন্য অপেক্ষা করে এবং ঈদ উদ্‌যাপন করেও বটে। তারা কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে পশু কুরবানীও করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মু'মিন একটি বিশেষ কুরবানীকে স্মরণ রাখে। সেই কুরবানীর গুরুত্বকে স্মরণ রাখে এবং উক্ত কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য স্মরণ রাখে। আর এমনভাবে স্মরণ রাখে যেভাবে স্মরণ রাখা উচিত। হাজার বছর পূর্বে পিতা-পুত্র যে কুরবানীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, সেই ঘটনার স্মরণ প্রত্যেক মু'মিনের

হৃদয়কে আবেগাপ্লুত করে দেয়।
সাধারণত মানুষ নিজের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের কিছুকাল পর তা ভুলে যায়। ভুলে যায় যে, সে একসময় কষ্টের মাঝে দিন কাটিয়েছে, এরপর সে জাগতিক কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই ঘটনা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত করে কুরবানীর একটি মানদণ্ড সর্বদার জন্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মু'মিনকে এই মানদণ্ড সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখার উপদেশ প্রদান করে প্রত্যেক মু'মিনের জন্য বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এটি স্মরণ রাখা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। কী উত্তম মানদণ্ড যে, আজও আমরা যখন সেই ঘটনা শুনি, এ বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ করি, তখন হৃদয়ে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় যে, এক ব্যক্তি বার্ধক্যে গিয়ে সন্তান লাভ করল, সে মুহূর্তে তাঁর বয়সও প্রায় নব্বই বছর। তাঁকে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বপ্নে আদেশ দেয়া হল যে, নিজ সন্তানকে কুরবানী কর, আর সেই আদেশ অনুযায়ী এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আর তাঁর আদেশের সামনে মাথা পেতে দেয়ার কত উত্তম মানদণ্ড তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন! হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ কতইনা উত্তম মর্যাদা যে, সেই আদেশ শোনামাত্র ছেলেকে উপুড় করে তার গলায় ছুরি চালাতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর কেবল পিতাই এ কুরবানীর জন্য প্রস্তুতি নেন নি, পিতার তো আধ্যাত্মিক এক মর্যাদা ছিলই, তিনি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বরং সেই সন্তানও নাবালক হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে সম্মত হন যে, ঠিক আছে, যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ এমনই হয়ে থাকে যে, আমি কুরবানী হই, তাহলে আমি প্রস্তুত। সেই নাবালকের উত্তরও আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সংরক্ষণ করেছেন। আর নাবালক সেই সন্তানের এই উত্তর ছিল যে,

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ *(সূরা আস্ সাফফাত: ১০৩)*

"হে আমার পিতা! আল্লাহ্ যে আদেশ দিয়েছেন, আপনি তা পূর্ণ করুন। নিশ্চয় আপনি আমাকে (নিজ ঈমানে প্রতিষ্ঠিত) ধৈর্যশীলদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত পাবেন। যারা কুরবানী করে থাকেন এবং সানন্দে কুরবানী করে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন, তাদের জন্য উক্ত উত্তর এক উপমা হয়ে আছে। আর যেসকল যুবক আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন এবং কুরবানীর জন্য প্রস্তুত তাদের উত্তর এবং মানদণ্ড এমনই হওয়া উচিত। অতএব আমরা যদি গভীরভাবে অভিনিবেশ করি, তাহলে কে আছে যে এমন উত্তর দ্বারা প্রভাবিত হবে না? বৃদ্ধদের জন্য কুরবানীর উপমা প্রতিষ্ঠা করেছেন এক নব্বই বছর বয়স্ক বৃদ্ধ। নাবালক ও যুবকদের জন্য আদর্শ উপস্থাপন করেছেন এক নাবালক। অতএব আমরা যখন এ ঘটনা শুনি এবং পাঠ করি তখন আমরা সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। আধিকাংশের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয় বরং আমাদেরকে এর পাশাপাশি নিজেদের সেই অঙ্গীকার যে, 'প্রত্যেক কুরবানীর জন্য সদা প্রস্তুত থাকব'- এ বিষয়েও আত্মজিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিজ সন্তানের কুরবানীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার আদেশে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এ দিক থেকে আরো গুরুত্ববহ আর কেবলমাত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করাই নয় বরং তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। আমরা যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নমনীয় স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করি তখন আমরা দেখি যে, তাঁর হৃদয় শত্রুর জন্যও পরিপূর্ণ নমনীয় ছিল। তিনি শত্রুর কষ্টও সহ্য করতে পারতেন না। আর তাঁর নমনীয় হৃদয়ের মানদণ্ড এরূপ ছিল যে, খোদা তা'লাও তাঁর এই বিশেষ গুণকে উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে সংরক্ষণ করেছেন আর খোদা তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন 'আওয়াহুন' ও 'হালীমুন' [তথা কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং সহনশীল]। অনেক নমনীয় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। যদি তাঁর স্বভাব এরূপই ছিল তবে নিজ সন্তানের জন্য তাঁর হৃদয় কি হাহাকার করে ওঠে নি? নিঃসন্দেহে হাহাকার করে উঠেছিল। কিন্তু সেসময় তাঁর ব্যক্তিগত কষ্টকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালবাসাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এই বিষয়টিই তাঁকে অন্যদের তুলনায় বিশিষ্ট করেছে। আর এটিই সেই বিশেষ গুণ যা খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততা, ভালবাসা ও ত্যাগের মানদণ্ড হওয়া উচিত। যে কারণে কিয়ামত অবধি মুসলমানরা যখনই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে তখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও অবশ্যই স্মরণ করবে। আর এটি শুধুমাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবানী নয় বরং পবিত্র কুরআন যেভাবে আমাদের জানায় যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) সানন্দে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন যা একটু আগেই উল্লেখ করা হল। তাঁর এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত তাঁকেও অন্যদের তুলনায় বিশিষ্ট করেছে। তিনি কেন এই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন? এ কারণে যে, তাঁর হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসার চারা রোপিত হয়েছিল। আর এ চারা রোপিত হবার কারণে তাঁর মাঝে এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, এ কুরবানী আমাদের উন্নতির সোপান। আর এ অনুভূতি পিতা-পুত্র দু'জনের মাঝেই সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব যখন আমরা হযরত

ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ঘটনা শুনে আবেগায়িত হই এবং অশ্রুসিক্ত হই তা এ জন্য যে, এ ঘটনার প্রভাব আমাদের মস্তিষ্কে এক অনুভূতিপূর্ণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু হয়তো আমাদের অধিকাংশের হৃদয় সে অনুভূতিপূর্ণ আবেগ ও অবস্থাকে বুঝতে সক্ষম হবে না যা সেসময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়ে ছিল। তখন তাঁর হৃদয়ের অবস্থা এরূপ ছিল যে, খোদা তা'লা আমাকে তাঁর জন্য নির্বাচিত করে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি কুরবানী করতে বলেছেন। আর এর প্রতিদানস্বরূপ আমি কী পাচ্ছি? আমি আমার খোদা, আমার প্রেমাস্পদের নৈকট্য লাভ করছি। তাঁর চিন্তাচেতনা এরূপ ছিল যে, আমার খোদা আমার নিকটবর্তী হচ্ছেন। আর এটি শুধুমাত্র এক চিন্তাচেতনাই ছিল না বরং প্রত্যেক মুসলমান কুরআন পাঠকারী, দরূদ পাঠকারী এ সম্পর্কে অবগত যে, খোদা তা'লা এ কুরবানীকে স্মরণ রেখেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত একে অমর করে দিয়েছেন। তাঁর কুরবানীকে আল্লাহ্ তা'লা এক অনন্য নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর নিজ দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা খোদা তা'লার সেই অনুগ্রহকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেননা খোদা তা'লা এই কুরবানীর জন্য আমাকে মনোনীত করেছেন। তিনি এটি বলেন নি যে, এটি আমার অনুগ্রহ বা আমার সন্তানের অনুগ্রহ যে, তাকে কুরবানী দেয়া হচ্ছে অথবা সে কুরবানীর জন্য সম্মত হয়েছে বরং এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে ও আমার সন্তানকে মনোনীত করেছেন। তারা কুরবানী করে এ ধারণাকে মন-মস্তিষ্কে প্রোথিত করে দিয়েছেন যে, আমার কুরবানীর কোন গুরুত্ব নেই বরং এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে এই কুরবানী করার যোগ্য মনে করেছেন। অতএব আমরা যখন সকল প্রকার কুরবানী করার প্রতিজ্ঞা করি তখন আমাদেরকেও এ ধারণাকে মন-মস্তিষ্কে প্রোথিত করার চেষ্টা করা অবশ্যক যে, আমাদের কুরবানী গুরুত্বহীন। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি যদি আমাদের কাছ থেকে কোন কুরবানী গ্রহণ করেন আর এর প্রতিদানস্বরূপ আমরা তার নৈকট্য লাভ করতে পারি। আর প্রকৃত সত্য এটিই যে, আমাদের কুরবানীসমূহ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর তুলনায় মূল্যহীন। আমরা যদি ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দোয়ার প্রতিজ্ঞার ওপর একটু হলেও আমল করি তবে খোদা তা'লা আমাদের সীমাহীনভাবে পুরস্কৃত করেন। অসংখ্য আহ্‌মদী এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রাখেন। এ বিষয়ে অসংখ্য চিঠিপত্র আমি পেয়ে থাকি যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ছোট ছোট কুরবানীকে গ্রহণ করে পুরস্কৃত করেছেন! উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক কুরবানী করার কয়েক ঘণ্টা পরেই তার প্রতিদান পেয়ে যায়। এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অতএব এ আবেগ অস্থায়ী হওয়া উচিত নয় বরং চিরস্থায়ী হওয়া উচিত। তারপরও খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণরাজিকে একবার লাভ করেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় বরং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের ইচ্ছা ও তার জন্য প্রয়াস যেন জীবনের চিরস্থায়ী অংশে পরিণত হয়। আর তখনই আমরা এটি বলতে পারব যে, আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণের চেষ্টা করেছি। আর ভবিষ্যতে এ চেষ্টাসমূহই উৎসাহ সৃষ্টি করে থাকে। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পুণ্যসমূহের প্রভাব ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহেও পরিলক্ষিত হয়। তখন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তখন স্ত্রী-সন্তানরাও এটি উপলব্ধি করতে পারে যে, আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা। অতএব এ পরিবেশ নিজ গৃহসমূহে সৃষ্টি করার জন্য দোয়া ও আমলের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিজ পুত্রের গলায় ছুরি চালানো ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর নিজ গলায় তার পিতার ছুরি চলানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া আবশ্যিকভাবে এক মহান দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ দৃষ্টান্তকে সম্মানিতও করেছেন। এ দৃষ্টান্তকে কবুল করে বাহ্যিকভাবে পুত্রের গলায় ছুরি চালানো থেকে তাকে বিরত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(সূরা আস সাফফাত: ১০৬)

তথা, 'তুমি তোমার স্বপ্ন অবশ্যই পূর্ণ করেছ। এখন ছুরি চালানোর প্রয়োজন নেই। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি'। সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান কী? এটি যে, তোমাকে ও তোমার পুত্রকে সীমাহীন নৈকট্যের সম্মানে ভূষিত করেছি। সে নৈকট্যের সম্মানে ভূষিত করার পর কুরবানীসমূহের যুগ সমাপ্ত হয় নি। বরং এরপর আরো নতুন কুরবানীসমূহের যুগ দান করেছি যেন সে কুরবানীমসমূহের মাধ্যমে খোদা তা'লার নৈকট্যের আরো দৃশ্যাবলী এ দু'জন দেখতে পায়। বরং এ দু'জন নন বরং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করা। তিনিও এ দৃশ্যাবলী যেন দেখতে পান। এর মাধ্যমে পুরুষদের জন্য এ দৃষ্টান্ত যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহ ও খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের প্রভাব তোমাদের স্ত্রীদের ওপরও যেন প্রকাশিত হয়। যদি প্রকৃতপক্ষে পুণ্যবান হও তবে এর প্রভাব কেবল নিজ গণ্ডিতেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে বরং স্ত্রীদের ওপরও যেন তা প্রকাশ পায়। নারীকে এ কুরবানীতে অন্তর্ভুক্ত করে খোদা তা'লা নারীদের জন্যও এক

দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। পুণ্যবতী নারী খোদা তা'লার ওপর ভরসা রাখে। তার প্রতি সিজদাবনত হয়। তাঁর নৈকট্য করে। আর এ কারণে তাকেও খোদা তা'লা নিজ নৈকট্য দান করেন। অতএব আমরা দেখতে পাই, খোদা তা'লা পুরো পরিবার অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, সন্তান তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলেন, ছুরি চালানো তো সাময়িক একটি কুরবানী ছিল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। কিন্তু এই তিনজনের কাছে কুরবানীর যে বৈশিষ্ট্যগুলো চাওয়া হয়েছিল তা ছিল একাকীত্বের, পৃথকীকরণের, বিচ্ছেদের ভীতিপূর্ণ অবস্থায় দৃঢ় কুরবানী। অতএব এই তিনটি অবস্থার কুরবানী তাদের নিকট চাওয়া হয়েছিল। আর এই তিনজনই তা মেনে নিয়েছিলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত হাজেরা আর হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে সাথে নিয়ে এমন এক স্থানে পৌঁছান যেখানে মাইলের পর মাইল কোন জনবসতি ছিল না। বরং অনুর্বর ভূমি ছিল। পানি ও খাবারশূন্য জায়গা ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার স্ত্রী ও সন্তানকে শুধুমাত্র এক মশক পানি ও খেজুরের একটি থলি প্রদান করে রেখে এসেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এটি জানতেন, যখন এই পানির মশক ও খেজুরের থলি শূন্য হয়ে যাবে তখন এখানে খাবার ও পানি কিছুই পাওয়া যাবে না। এরপর তার স্ত্রী ও সন্তান এখানে কিভাবে থাকবে তা তার জানা ছিল না। কিন্তু এ কুরবানী বা ত্যাগের বিষয়ে খোদা তা'লার নির্দেশ ছিল। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এ কুরবানী করছিলেন। যাহোক, যখন তিনি সামান্য খাবার ও পানি রেখে স্ত্রী-সন্তানকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন আর স্ত্রীকে বলেনও নি যে তাকে এখানে একা থাকতে হবে। এ অবস্থায় হযরত হাজেরা এটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এই বিচ্ছেদ তো ক্ষণস্থায়ী মনে হচ্ছে না বরং এটি তো দীর্ঘস্থায়ী মনে হচ্ছে। তখন তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের এখানে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই অবস্থার চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। তিনি (রা.) বলেন, সেসময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রকৃতিগত হৃদয়ানুভূতি যা কষ্টকর ছিল তা বিদ্যমান ছিল। আর আওয়াহুন ও মুনিব হওয়ার কারণে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। হযরত হাজেরা পুনরায় একই প্রশ্ন করেন, আমাদের ছেড়ে কোথায় চললেন? এভাবে কায়েকবার জিজ্ঞেস করার পরও হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ আবেগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে উত্তর দিতে পারেন নি। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত নমনীয় স্বভাববিশিষ্ট মানুষের জন্য এর উত্তর দেয়াও অসম্ভব ছিল। তিনি বাহ্যত দেখতে পাচ্ছিলেন, এরূপ জনবসতিহীন স্থানে তাদের অবস্থা করুণ হবে। অতএব একদিকে স্ত্রী ও সন্তানের ভালবাসার মানবীয় অধিকার আর অপরদিকে স্বভাবজাত অত্যন্ত নমনীয় বৈশিষ্ট্য তাকে নিশ্চুপ করে দিয়েছিল। আর তিনি এ ভয়ও পাচ্ছিলেন যদি উত্তর দেই তবে স্বভাবজাত আবেগ না আবার প্রকাশিত হয়। আর হযরত হাজেরা অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন আর অন্যদিকে এই চিন্তাও ছিল, আবেগের বশবর্তী হয়ে পাছে আবার কুরবানীতে কোন কমতি দেখা দেয় যা তিনি এবং তার স্ত্রী-পুত্র একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে করতে যাচ্ছিলেন এবং যার ফলে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ হবে- তারা নিশ্চুপ থাকলেন। অতঃপর হযরত হাজেরা যখন বললেন, আপনাকে কি আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করতে বলেছেন? তখনও তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে কেবল আকাশের দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না বা কোন উত্তর দিলেন না। হযরত হাজেরা যখন এই ইঙ্গিত দেখলেন তখন তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বললেন, বিষয় যদি এটিই হয় তবে খোদা তা'লা আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আপনার যেখানে যাওয়ার নিশ্চিন্তে চলে যান। বাহ্যত এই কথা মেনে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব, কেননা এমন অনাবাদী এলাকা যেখানে পানির পাত্র খালি হয়ে যাওয়ার পর পানি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, খেজুরের থলি খালি হবার পর খেজুর পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই কিংবা কোন ধরণের খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের কষ্ট দূর করার মত কিংবা কমপক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শনের মত কেউ সেখানে পৌঁছবে বা কোন মানুষের দেখা পাওয়া যাবে- এমনটি একেবারেই অসম্ভব ছিল। এই বিরাণ মরুভূমিতে কে-ইবা কোথা থেকে আসবে! হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে হযরত হাজেরার মাঝেও এই পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের আকাঙ্খার ক্ষেত্রে তিনিও চরম মার্গে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি নির্ভয়ে বলে দিলেন, এটি যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হয় তাহলে আমি কোনকিছুর পরোয়া করি না। নিশ্চিতভাবে হযরত হাজেরার এই বাক্য আরশের অধিপতি শুনে থাকবেন যে, 'এটি যদি খোদা তা'লার আদেশ হয় তাহলে তিনি আমাদেরকে কখনো বিনষ্ট করবেন না', তখন খোদা তা'লাও বলে থাকবেন, 'নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে এবং তোমার পুত্রকে কখনো বিনষ্ট করব না'। আর পরবর্তী অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লা এমনটিই করেছেন যেমনটি তাঁর থেকে প্রত্যাশা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা কেবল তাদেরকে বিনষ্ট করা থেকেই রক্ষা করেন নি বরং তাদের মাঝ থেকে এমন এক জাতি সৃষ্টি করেছেন যার মাঝে খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা

(সা.)-এর মত মহামর্যাদাবান নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনিই (সা.) সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বাদশাহ্। তাঁর (সা.) উসীলাতেই খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। হযরত হাজেরা (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে এ জগত পরিত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের ছায়াতলে একত্রিত করেছেন। বর্তমানে লক্ষ কোটি মানুষ হজ্জ এবং উমরা পালন করেন। তারা এর মাধ্যমে হযরত হাজেরার কুরবানীর চেতনাকে উজ্জীবিত করেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা হযরত হাজেরার এই কুরবানীকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, একটি সম্মান প্রদান করেছেন। তিনি খোদা তা'লার ওপর ভরসা করে তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জগতের মায়া পরিত্যাগ করেছিলেন আর বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার খাতিরে তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়তে বাধ্য হচ্ছে। অতএব তার এই কুরবানী কোন সাধারণ কুরবানী ছিল না। তার ঈমানের এই যে মানদণ্ড, 'খোদার জন্য যে কাজ করা হয় তা তিনি বিনষ্ট করেন না'-এটি কোন সাধারণ ঈমানের দৃষ্টান্ত ছিল না। আর আমি যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত এই মানদণ্ডকে পরিপূর্ণ করার এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আজ হল সেই বংশের খোদাভরসা এবং কুরবানী করার মান স্মরণ করার দিন। একইসাথে আমাদেরকে এটি খতিয়ে দেখতে হবে, আমাদের জন্য কি কেবল এই কুরবানীর ঘটনা, এই বংশের খোদাভরসা এবং এই কুরবানীর স্মরণ করাটাই যথেষ্ট? না, বরং এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশ্বস্ততা এবং কুরবানীকে আদর্শ বানাতে হবে। হযরত হাজেরার কুরবানীকে আমাদের মানদণ্ড বানাতে হবে। প্রত্যেক মহিলা যেন ভালভাবে দেখে যে, এই মানদণ্ডে পৌঁছাতে হলে আমাদের কি করতে হবে? লাজনারা যখন এই আয়াত পাঠ করে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের কুরবানী করতে প্রস্তুত। এ প্রেক্ষিতে আমি জানতে পেরেছি, কোন কোন মহিলা সেসময় চুপ হয়ে যায় আর বলে, আমরা প্রস্তুত নই। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যদি ভরসা থাকে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় এবং তাঁর নৈকট্য লাভের আকাঙ্খা যদি সকল আকাঙ্খার ওপর প্রাধান্য পায় তবে এ ধরণের চিন্তা আসতেই পারে না। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার তোমরা করেছ। আর এটি এমন এক অঙ্গীকার যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার দিকে আহ্বান জানায়। অঙ্গীকার যদি করে থাকো তাহলে প্রত্যেক আহ্‌মদী পুরুষ, মহিলা, যুবক এবং শিশুকে তা পূরণ করতে হবে। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে তখন তিনি তাকে বিনষ্ট করেন না, বরং পুরস্কারে ভূষিত করেন। আমাদের পুরুষেরা যখন নিজেদেরকে ইব্রাহীমের মানদণ্ডে উপনীত করবেন তখন এই আধ্যাত্মিক মানদণ্ড মহিলা ও বাচ্চাদের মাঝেও প্রবিষ্ট হবে। তাই সর্বপ্রথম পুরুষদের নিজেদের চিন্তাভাবনা এবং কুরবানীর মানকে উন্নত করতে হবে। স্ত্রী-সন্তানদের যদি খোদাভরসা ও কুরবানীর এই মানে উপনীত করতে হয় তবে পুরুষদের অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এটি মনে করা উচিত নয় যে, কেবল নিজের মাঝে সাধারণ কিছু পরিবর্তন সাধন করলেই দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়ে গেল। আর এই দৃষ্টান্ত কেবল গল্পাকারে আল্লাহ্ তা'লা সংরক্ষণ করে রাখেন নি বরং এটিকে আমাদের আদর্শ আখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যেক পুরুষ যখন ইবরাহীমী আদর্শ অনুযায়ী চলা আরম্ভ করবে এবং তদনুযায়ী চলার মাধ্যমে বিশ্বস্ততার মানকে উন্নীত করার চেষ্টা করবে; প্রত্যেক মহিলা যখন হাজেরার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত থাকবে এবং প্রত্যেক যুবক যখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আদর্শ স্থাপন করতে সচেষ্ট হবে তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষিত হবে। আর তখনই সত্যিকার কুরবানী এবং এর ফলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অভিজ্ঞতাও লাভ হবে। এযুগে মহানবী (সা.)-এর যে সত্য গোলামকে আমরা মেনেছি যেন ইসলামের পুনর্জীবন লাভের কাজে অংশীদার হতে পারি- তাঁকেও আল্লাহ্ তা'লা ইবরাহীম নামে অভিহিত করেছেন। কয়েক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এলহামের মাধ্যমে ইবরাহীম নামে সম্বোধন করেছেন। অতএব এই ইবরাহীমকে যদি আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি, ইসলামকে সারা পৃথিবীতে বিজয় লাভ করাতে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা সারাবিশ্বে উড্ডীন করতে এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করার খাতিরে মেনে থাকি তবে আমাদের প্রত্যেককে ইসমাঈল হবার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক মহিলাকে হাজেরা হবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা ধর্মের উদ্দেশ্যে সকল কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকলে পরেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য নতুন নতুন পথ উন্মোচন করবেন। আর ইসলামের উন্নতির যে পথ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার গোলামের মাধ্যমে উন্মোচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে আমরাও শামিল হতে পারবো। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে যদি সত্যিকার অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দান করার এই অঙ্গীকারের ওপর আমল করে তবে আমরা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব সাধন করতে পারব। আমরা যদি ইসলামী শিক্ষামালার ওপর আমল করার মাধ্যমে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি তবে পৃথিবীতে একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব

সাধন করতে সক্ষম হব। আমরা যদি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা জগতে বিস্তার লাভ করার মাধ্যমে গোটা জগদ্বাসীকে ইসলামের পতাকাতলে আনতে পারি তবে আমরা সেই শহীদদের কুরবানীর বদলা নিতে সক্ষম হব যাদেরকে এযুগের ইমামকে মানার কারণে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে এই জামা'তের সূচনা করেছেন যাতে সেসকল কল্যাণ জগতে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় যা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার মান্যকারী এবং মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত। এ উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তীরাও কুরবানী দিয়েছেন, সবচেয়ে বেশি তারা নিজেদের জীবনের কুরবানী দিয়েছেন। আমরাও আমাদের জীবন, সম্পদ এবং সময় কুরবানী করার অঙ্গীকার করে থাকি, তাই আমাদেরকেও এই অঙ্গীকারের কথা দৃষ্টিপটে রেখে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। আর আমাদেরকে কুরবানী করতে হবে এবং অনেক মানুষ কুরবানী দিয়েও আসছে। কুরবানী ছাড়া এ বিপ্লব কখনো সাধিত হবে না আর কখনো হয়ও না। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সেই মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যারা বলে থাকে, আমরা কুরবানীর কথা আসলে চুপ হয়ে যাই। একদিকে সেই মায়েরা আছেন যারা নিজেদের সন্তানকে ওয়াক্‌ফে নও স্কীমে ওয়াক্‌ফ করেছেন ঠিকই কিন্তু সন্তান যখন যুবক বয়সে উপনীত হয় তখন কতক পিতামাতার পক্ষ থেকে এই অজুহাত দেখানো হয় যে, আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আমাদের সন্তান যদি কেবল জামা'তের খিদমত করে তবে অল্প ভাতায় চলতে পারবো না। তাই তাকে জাগতিক পেশা অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করুন। একদিকে তারাই কুরবানী করার কথা বলে এবং নিজেরাই তাদেরকে উপস্থাপন করেছে অপরদিকে তারাই আবার জাগতিকতার দিকে তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে। একইভাবে কতক ওয়াক্‌ফে নও সন্তান রয়েছে যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার পর বলে, জামা'তের সেবা করা খুবই কঠিন। আমরা অল্প পয়সায় চলতে পারি না। আমাদেরকে জাগতিক চাকরি-বাকরি করতে অনুমতি দিন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দেয়ার এবং কুরবানীর অঙ্গীকার যখন করেছেন, পাশাপাশি জন্মের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা পিতামাতাকে সন্তানদের পেশ করার সামর্থও দিয়েছেন তারপরও এই ধরণের ওজর-আপত্তি প্রদর্শনের কোন অর্থ হয় না। তাই এই অঙ্গীকার পালন করা অত্যন্ত জরুরী। অল্প ভাতা যদি হয়েও থাকে তবে তার মাঝেই আল্লাহ্ তা'লা বরকত প্রদান করবেন। অতএব যুবক ওয়াক্‌ফে নও সন্তানেরা নিজেদের মুবাল্লিগ ও মুরুব্বী হওয়ার জন্য উপস্থাপন করুন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা শিক্ষক হয়ে জামা'তের জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করুন। কুরবানী করুন এবং কুরবানীর মান বৃদ্ধি করুন। কেবল গল্প-কাহিনী শুনে খুশি হয়ে যাবেন না। কেবল সাময়িক এসব ঘটনা শুনে এবং পুরনো ঘটনা শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে আনন্দিত হবেন না, বরং এটি এজন্য যে, আমাদেরকে নিজেদের উপমা স্থাপন করতে হবে। জাগতিক রাজত্বের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, জাগতিক সরকার ব্যবস্থাপনার সাথে আমাদের কোন স্বার্থ নেই, সরকারি ব্যবস্থাপনার সহায়-সম্পত্তির সাথেও আমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং জাগতিক ক্ষমতার কোন লোভও আমাদের নেই আর থাকাও উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি কোন স্বার্থ আমাদের থেকে থাকে বা থাকা উচিত তা হল, কীভাবে আমরা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় সাধন করতে পারব? কীভাবে আমরা সারাবিশ্বকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হব? কীভাবে আমরা এক আল্লাহ্‌র রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো? কীভাবে আমরা পথভ্রষ্ট মানুষদের খোদার প্রতি আকৃষ্ট করাতে পারি? কীভাবে আমরা মানুষকে একে অপরের অধিকার আদায়কারী বানাতে পারি? অতএব আমাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠার এটিই মূল উদ্দেশ্য। এটাই আহ্‌মদীদের উদ্দেশ্য আর বিশেষকরে ওয়াক্‌ফে নওদের তো এটাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর এজন্যই তারা ওয়াক্‌ফ্। জামেয়াতে আসার জন্য নিজেদের ওয়াক্‌ফ করুন এবং বেশি সংখ্যক মুরুব্বী কিংবা মুবাল্লিগ হোন যাতে ইসলামের এই বাণী সারা পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অতএব আমি যেসব কথা বর্ণনা করেছি সেগুলোই হল আহ্‌মদীয়া জামা'তের মূল উদ্দেশ্য। আর এজন্য আমাদের কুরবানী দিতে হবে যার ঘোষণা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারংবার দিয়েছেন। এ কথাগুলোর মূল দাবি হল, কুরবানী। আমি যেভাবে বলেছি, কুরবানীর ঘটনা পড়লেই বিপ্লব সাধিত হয় না। এজন্য প্রত্যেক আহ্‌মদী মহিলাকে হাজেরা হতে হবে এবং প্রত্যেক আহ্‌মদী যুবককে ইসমাঈল হতে হবে। আর প্রত্যেক দেশ, জাতি, বংশ থেকে প্রত্যেক আহ্‌মদীকে এই মান উপস্থাপন করতে হবে। কেবল তখনই আমরা পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারব। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যখন এভাবে সম্মিলিত কুরবানী উপস্থাপিত হবে তখনই আমরা সেই ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হব অর্থাৎ তওহীদ প্রতিষ্ঠা, যার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) কুরবানী দিয়েছিলেন। আর খোদা তা'লার প্রথম ঘর তাঁর একত্ববাদের নিদর্শনস্বরূপ জাগরূক ছিল। আর তখনই আমরা এযুগের ইবরাহীম এবং মহানবী (সা.)-এর প্রিয় সত্য ইমাম মাহদীর আগমনের উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হবো অর্থাৎ এক ধর্মে সকলকে সমবেত করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে সত্যিকার কুরবানীর উপকরণ সৃষ্টি করুন। আমরা

যেন সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দানকারী হই। প্রত্যেক কুরবানীর ঈদ যেন আমাদেরকে ইসলামের উন্নতির নতুন দিগন্ত প্রদর্শনকারী হয়। আমরা যেন এমন গ্রহণীয় কুরবানী করতে সমর্থ হই যার কল্যাণ ও আশীষ একাধারে ইহকাল ও পরকালে লাভ করতে থাকি।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে আপনারা সেই বন্দীদের স্মরণ রাখবেন যারা কেবল আহ্‌মদীয়াতের কারণে কারাবরণ করছেন। ধর্মের খাতিরে দুর্বিষহ পরিবেশে জেলখানায় বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। বিশেষকরে পাকিস্তানে আর তারা আনন্দের সাথে তা সহ্য করছেন। একজন মহিলাও এমন পরিস্থিতিতে বন্দীদশা ভোগ করছেন। মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তার ওপর ভয়াবহ ধারা জারি করা হয়েছে। আর এসব কেবল এজন্যই যে, তিনি যুগের ইমামকে মেনেছে। শহীদদের পরিবারদেরও দোয়াতে স্মরণ রাখুন। ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী যারা মুরব্বী, মুবাল্লিগ, মুয়াল্লিম রয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করুন যেন তারা সবাই নিজেদের ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনকারী হন এবং প্রকৃত কুরবানীর মাধ্যমে পালনকারী হন। বিভিন্ন দেশে এমনকি আফ্রিকাতেও অনেক মুয়াল্লিম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফিক দান করুন কেননা তারা অল্পবিস্তর তরবিয়ত লাভ করেও অর্থাৎ মুয়াল্লিম ক্লাসে কমবেশি যা-ই জ্ঞান অর্জন করেছেন তা থেকে অনেক বড় বড় কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাজে, নিষ্ঠায়, বিশ্বস্ততায়, জ্ঞানে ও আধ্যাত্মিকতায় বরকত দান করুন। তাদেরকে স্বীয় হিফাযতে রাখুন। আর আমি যেভাবে বলেছি, নিষ্ঠার সাথে নিজের ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালনকারী হোন। সমস্যায় জর্জরিত মানুষদের জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যা দূরীভূত করেন, দুঃশ্চিন্তা দূর করেন। স্বার্থান্বেষী আলেমদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যও দোয়া করুন। তারা তাদের অনিষ্টের জাল বিছিয়ে রেখেছেন বিশেষকরে পাকিস্তানে, এমনিভাবে আফ্রিকার কতক দেশেও। প্রত্যেক ক্ষমতাবান অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে নিষ্পাপ মানুষদের বাঁচার জন্য দোয়া করুন। এই ঈদে পাকিস্তানে বিশেষভাবে এই হট্টগোল পাকানো হচ্ছে যে, যা মূলত সবসময়ই হয় বরং এবার একটু বেশি হচ্ছে আর তা হল, আহ্‌মদীরা ঈদে কুরবানী করলে তাদের নামে মুকাদ্দমা দায়ের করা হবে, তাদেরকে বন্দী করা হবে। তাই এ ধরণের দুষ্ট লোকের দুষ্টামী থেকে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহ্‌মদীকে সুরক্ষিত রাখুন। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য পূরণকারী হই আর এজন্যও আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। আর এ দোয়াও আমাদের অনেক বেশি করা উচিত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ হয় তথা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকা যেন সমগ্র পৃথিবীতে উড্ডীন হয় আর সারা বিশ্বে তওহীদ প্রতিষ্ঠা হয়। বিরোধিতার কথা যদি বলতেই হয় তাহলে কেবল পাকিস্তানই নয় বরং আফ্রিকাতেও কতক স্থানে বাইরে থেকে মানুষ গিয়ে সেখানকার স্থানীয় মানুষদের বিভ্রান্তিতে ফেলে এবং সেখানে বিরোধিতা সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং দৃঢ়। কোন বিরোধিতার পরোয়া করছেন না। সেখানে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা স্বীয় ঈমানের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে কতক স্থানে আমাদের মসজিদ দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আফ্রিকাতেও হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সেসব স্থানেও যেখানে জামা'তের মসজিদ অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করুন। সর্বোপরি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত যেন আমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের ভাগীদার হতে পারি। আজকেও জুমুআর খুতবা সঠিক সময়েই হবে, ইনশাআল্লাহ্। এখন আমরা দোয়া করব কিন্তু দোয়ার পূর্বে আপনাদের সবাইকে, সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল আহ্‌মদীকে এবং আপনাদেরকেও ঈদ মোবারক। আসুন দোয়া করি। সানী খুতবার পরে দোয়া হবে।

(পাক্ষিক আহ্‌মদী ডেস্ক অনূদিত)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম।

খাকসার,

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

পর্ব-১৭

প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

গত ১১ জুন ২০২১ সালে ইসরায়েলের পশ্চিম তীরের আহ্‌মদীরা ভার্চুয়াল মোলাকাতে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। আমরা আজকের পর্বে এই মোলাকাতের বিশেষ বিশেষ প্রশ্নোত্তর পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

প্রশ্ন: বিরোধিতার ভয়ে একজন আহ্‌মদী কি তার নিজের বিশ্বাস গোপন করতে পারে?

প্রিয় হুযূর (আই.): যদি কোন ব্যক্তি ভয় পায় এবং বিরোধিতার সামনে না দাঁড়াতে পারে সেক্ষেত্রে ঠিক আছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ করে কিছু মহিলা বিরোধিতার মোকাবেলা করতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে যদি তাদের হৃদয়ে আহ্‌মদীয়াতের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে কোন সমস্যা নেই। প্রকাশ্যে এটি ঘোষণা না-ও করতে পারেন। কিন্তু যদি একজন ব্যক্তির মাঝে বিরোধিতা মোকাবেলার দৃঢ়তা এবং সাহস থাকে তাহলে তার বিশ্বাসের প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া উচিত। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা এমন কিছু সাহাবীদের খুঁজে পাই যারা একদম প্রাথমিক যুগে মুসলমান হয়েছিলেন। তারা গোত্রপ্রধান বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার অধীনে ছিলেন। কিন্তু তারা মুসলমান হওয়ার পর তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন, আমরাও অন্যান্য মুসলমান ভাইদের মত একই অত্যাচার এবং নির্মমতা সহ্য করতে চাই। একইভাবে আমরা ইতিহাস থেকে এটাও জানতে পারি যে, মহানবী (সা.) কয়েকজনকে বিরোধিতা সহ্য করতে না পারার কারণে তাদের বিশ্বাস গোপন রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময় বিবেচনায় এটি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ পদক্ষেপ ছিল। মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পরেও মক্কায় অনেক মুসলমান থেকে গিয়েছিল। যদিও তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারা তাদের বিশ্বাসকে গোপন রাখত। এছাড়া যখন কোন কাফের বাহিনী অভিযানে যেত তখন তাদের সাথে দু'একজন এমন ব্যক্তি থাকত যারা নিজেদের বিশ্বাস লুকিয়ে তাদের সাথে যেত। এমন দু'জন ব্যক্তির কথা আমি কিছুদিন আগে আমার জুমুআর খুতবায় উল্লেখ করেছি। একটি যুদ্ধে যখন কাফের বাহিনী অভিযানে বের হয় তখন তাদের সাথে দু'জন এমন ব্যক্তি বের হয়েছিল যারা নিজেদের বিশ্বাস গোপন করেছিল। কিন্তু মুসলমান বাহিনীর কাছে পৌঁছানোর পর তারা কাফেরদের দল পরিত্যাগ করে। এরপর তারা মুসলমান বাহিনীতে যোগদান করে এবং বলে, আমরা এখানে আসার জন্য কাফের বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিলাম। অতএব তারা সেই সময়ে তাদের ঈমান গোপন করেছিল। আর মহানবী (সা.) তাদের ঈমান গোপন করার কারণে কিছুই বলেন নি। বরং তিনি (সা.) তাদের সুরক্ষা দিতে নির্দেশ দেন। তাদের মুসলমান দলে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। অতএব ইতিহাস থেকে আমরা এমন ঘটনা দেখতে পাই। আর কয়েক মাস আগেই আমি আমার জুমুআর খুতবায় এই ঘটনা বর্ণনা করেছি। অতএব এক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই এবং বিশেষকরে মহিলাদের ক্ষেত্রে যদি তারা মনে করে, তাদের ঈমানের ঘোষণার কারণে তারা চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হবে এবং তারা এই বিরোধিতা মোকাবেলা করতে পারবে না তাহলে তারা তাদের ঈমান গোপন রাখতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি কারো ক্ষেত্রে ঈমান প্রকাশ্যে ঘোষণা করার সুযোগ থাকে তাহলে তার ঈমান প্রকাশ্যে ঘোষণা করা উচিত।

প্রশ্ন: প্রথমতঃ একজন আহ্‌মদীর কি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়ার অনুমতি রয়েছে? দ্বিতীয়তঃ একজন

আহ্‌মদী কি সরকার বিরোধী কোন স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা বিদ্রোহী আন্দোলনে যোগ দিতে পারবে?

প্রিয় হুযূর (আই.): একজন আহ্‌মদী তার দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক। তাই সে তার দেশের রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কেননা যখন সে কোন রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্ত হবে তখন তার কথা সেই মানুষের কাছেও পৌঁছাবে যাদের কাছে সাধারণত পৌঁছানো সম্ভব হয় না। যদি আইন প্রণয়ন এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে তার কোন ভূমিকা থাকে, তাহলে সে দেশের জন্য কল্যাণকর নীতি প্রণয়ন করবে। আর সে তার অবস্থান থেকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী দায়িত্বশীল আন্তরিক পরামর্শ দিবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, যখন তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়া হবে তখন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে পরামর্শ দাও। অতএব রাজনৈতিক দলে আহ্‌মদীদের যোগ দিতে কোন সমস্যা নেই। পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য আহ্‌মদী রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র উপমহাদেশ ঐক্যবদ্ধ ছিল। সেখানে বসবাসরত আমাদের অনেক সদস্য রাজনীতি করতেন এবং সংসদে তাদের দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন। দেশ ভাগের পর আহ্‌মদীদের অমুসলিম ঘোষণার আগ পর্যন্ত আহ্‌মদী সদস্যরা জাতীয় সংসদ এবং রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। একইভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও, উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকাতে আমাদের অনেক এমন সদস্য আছে, যারা উচ্চ শিক্ষিত। তারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করছে। এমনকি তাদের মাঝে কয়েকজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং দেশের মন্ত্রীও হয়েছেন। এভাবে তারা সকলেই দেশের কল্যাণের জন্য কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। একইভাবে ইউরোপেও আমাদের অনেক আহ্‌মদী আছেন। তারা যেখানেই সুযোগ পাচ্ছেন নিজের দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অতএব রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়ায় কোন সমস্যা নেই। মূলত রাজনীতিতে যোগ না দেয়ার কোন কারণ নেই। যেহেতু আমরা দেশের নাগরিক তাই দেশের সরকার গঠনে এবং প্রশাসনিক কাজে আমাদের ভূমিকা থাকা উচিত। বরং আমাদের আরো বেশি ভূমিকা রাখা উচিত যাতে অন্যরা দেখে, আমরা কত উত্তমভাবে ও বিশ্বস্ততার সাথে দেশের সেবা করতে পারি। তারা যেন অনুধাবন করতে পারে, আহ্‌মদীরা নাগরিক হিসেবে দেশের প্রতি কতটা বিশ্বস্ত এবং দেশের উন্নতিকল্পে তারা কিভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিদ্রোহ আন্দোলনে অংশ নেবার প্রশ্নের উত্তর হল, প্রথমতঃ আহ্‌মদীদের এমন সকল আন্দোলন এড়িয়ে চলা উচিত যাতে জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর আর নৈরাজ্য রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে যদি কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয় তাহলে সেই আন্দোলনে আহ্‌মদীদের অংশ নেয়া উচিত। কেননা এটি সরকারি কাজ এবং তারা তাদের কর্মপন্থা অনুযায়ী কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দেশীয় কোন যুদ্ধে দেশীয় কোন বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করার দরকার হয় তাহলে আহ্‌মদীদের তা করা উচিত। অনেক দেশে আহ্‌মদীরা তাদের সেনাবাহিনীতে অংশ নিয়েছে এবং সৈনিক হিসেবে তারা দেশের স্বার্থে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এমন আন্দোলন যা সরকার সমর্থিত নয়, সরকারী আইনের পরিপন্থী এবং স্বাধীনতার নামে যে আন্দোলনে শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা হয় এমন আন্দোলন থেকে আহ্‌মদীদের দূরে থাকা উচিত। কিন্তু যদি সরকার বলে যে, এখন দেশের জন্য ত্যাগের সময়, অতএব সেনাবাহিনীতে যোগ দাও এবং সরকারকে সাহায্য কর। তাহলে অবস্থার নিরিখে একজন আহ্‌মদীর অবশ্যই যোগ দেয়া উচিত। কিন্তু সকল বেসরকারী আন্দোলনে যোগ দিলে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাবে। তাই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। যে দলে আপনি যোগ দিতে চাচ্ছেন 'তাদের বিষয়ে সরকারের অভিমত কি।' মাঝে মাঝে এমন অনেক আন্দোলন হয়ে থাকে যাতে সরকারের পূর্ণ সমর্থন থাকে। এমন আন্দোলনে কেউ চাইলে যোগ দিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিশ্লেষণ করা উচিত যে, এই আন্দোলনে কতটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে। যদি এই সকল নৈরাজ্য থেকে বাঁচার উপায় থাকে তাহলে একজন আহ্‌মদীর সকল ধরনের নৈরাজ্য থেকে দূরে থাকা উচিত। আর যদি একদম উপায় না-ই থাকে সেক্ষেত্রেও প্রজ্ঞার সাথে সকল নৈরাজ্য থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রশ্ন: একজন ব্যক্তি যদি আধ্যাত্মিক এক স্তর থেকে পরবর্তী ধাপে উন্নতি করে তাহলে সে কীভাবে তা বুঝতে পারবে?

প্রিয় হুযূর (আই.): একজন প্রকৃত মু'মিনের আধ্যাত্মিক উন্নতি করার লক্ষ্যে ক্রমাগত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। সে কোন্ আধ্যাত্মিক স্তরে আছে অথবা এর পরবর্তী স্তর কী তা দেখা বা জানার দরকার নেই। একমাত্র মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন, একটি আধ্যাত্মিক স্তরের শেষ কোথায় অথবা পরবর্তী স্তর কখন শুরু হবে? অতএব একজন প্রকৃত মু'মিনের ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। ধারাবাহিকভাবে দৃঢ় চেষ্টার মাধ্যমে সৎকর্ম ও আত্মসংশোধনের জিহাদ করে যাওয়া উচিত। যখন কেউ নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন অনুভব করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন সে পরবর্তী স্তরের কথা ভাবেই না। সর্বোচ্চ স্তর অর্জনের চেষ্টাও করে না। তার শুধুমাত্র একটাই চিন্তা, কীভাবে সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করবে? যে সম্পর্ক আল্লাহ্ এবং তার মাঝে স্থাপিত হয়েছে তা যেন বিনষ্ট না হয়। যখন কেউ ভাবে যে, আমি অমুক আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করেছি। তখন মানুষের মাঝে অহঙ্কার তৈরি হতে থাকে। অহঙ্কার অত্যন্ত ক্ষতিকর জিনিস। কেবলমাত্র অহঙ্কারই ইবলিসকে আনুগত্য প্রদর্শনে বাধা দিয়েছিল। অতএব, মানুষের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, আমাদের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ্‌র অসংখ্য আদেশ নিষেধ রয়েছে। আপনি কীভাবে সকল আধ্যাত্মিক স্তর সম্পর্কে জানবেন? আপনি কুরআন অনুসন্ধান করে দেখুন। কুরআনে প্রায় ৭০০ আদেশ নিষেধ রয়েছে। কিছু জায়গায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই সংখ্যা ১২০০ বলেছেন। অতএব আপনি কি এই ১২০০ আদেশ নিষেধের ওপর আমল করেছেন? আপনি কি এই সব আদেশ নিষেধের

অনুসন্ধান করেছেন? যখন আপনি এই সকল আদেশ নিষেধ অনুসন্ধান করে নিবেন এবং আমল করবেন তখন আপনি পরবর্তী স্তর অর্জনের কথা ভাববেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পরবর্তী স্তর দান করবেন। মানুষ কেবলমাত্র তার চেষ্টার মাধ্যমে পরবর্তী স্তর অর্জন করতে পারে না। অতএব, একজন প্রকৃত মু'মিনের কাজ হল, বিনয় এবং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা। তাঁর আদেশ নিষেধের ওপর ধারাবাহিকভাবে আমল করা এবং নিজ সাধ্যানুযায়ী সবধরনের চেষ্টা করে যাওয়া। এটাই মূল বিষয়। এটি যদি মানুষের হৃদয়ে থাকে তাহলে ধীরে ধীরে তার উন্নতি হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা এই সকল স্তর নির্ধারণ করেছেন। একমাত্র তিনিই জানেন কোন্ স্তর তুমি অর্জন করেছ এবং তোমার জন্য পরবর্তী স্তর কোন্‌টি মানুষ নিজে কখনোই বুঝতে পারে না যে, সে কোন্ স্তরে আছে। একজন মুত্তাকীর কাজ হল, তাকওয়ার সাথে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলা, আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা। এটাই আমাদের কাজ এবং এর জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আর এটি ধারাবাহিক চেষ্টা এবং জিহাদের দাবি রাখে। কেননা জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায়। তখন আল্লাহ্‌ই মানুষকে তার স্তর এবং মর্যাদার কথা জানিয়ে দিবেন।

প্রশ্ন: হুযূর! আফ্রিকানদের প্রতি আপনার বিশেষ ভালবাসা আছে। আপনি তাদের দেখে খুশি হন। আমরা আরব আহ্‌মদীরা কীভাবে যুগ-খলীফার এই ভালবাসা লাভ করতে পারি?

প্রিয় হুযূর (আই.): মূল বিষয় হল, যখনই আমি কোন নিষ্ঠাবান আহ্‌মদীর সাথে সাক্ষাত করি বা কথা বলি তখন আমি খুশি হই। আমি এখন আপনার সাথে হাস্যবদনে কথা বলছি। আফ্রিকানদের জন্য আমার যে অনুভূতি আপনার জন্যও একই অনুভূতি। একজন ইউরোপিয়ান আহ্‌মদীর জন্যও একই অনুভূতি। একজন নিষ্ঠাবান আহ্‌মদী– হোক সে এশিয়ান, আফ্রিকান, ইউরোপিয়ান, আরব, দক্ষিণ আমেরিকান কিংবা পৃথিবীর যে দেশেরই হোক না কেন সবাই আমার চোখে সমান। তাদের ভালবাসার অভিব্যক্তি আমাকেও একইভাবে তাদেরকে ভালবাসতে এবং তার মত একই অভিব্যক্তি প্রকাশে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। না আপনারা আফ্রিকানদের থেকে কম, আর না আফ্রিকানরা আপনাদের থেকে কম। আবার আপনারাও পাকিস্তানের থেকে বেশি না, কিংবা আফ্রিকানরাও অন্য কোন দেশ থেকে বেশি না। কোন নিষ্ঠাবান আহ্‌মদী যার খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে তার সাথে যখনই আমার সাক্ষাত হয় আমি খুব খুশি হই। হোক আফ্রিকান শিশু বা ইউরোপিয়ান, হোক দক্ষিণ আমেরিকান শিশু বা পাকিস্তানি শিশু, হোক যুবক, পুরুষ কিংবা নারী। সকল নিষ্ঠাবান আহ্‌মদীকে দেখে আমি খুশি হই। তাদের সকলের জন্য আমার হৃদয়ে স্নেহ ভালবাসার অনুভূতি জাগ্রত হয়। এজন্য আমি সর্বদা হাস্যবদনে সাক্ষাত করি। আমার মনে হয় না আমি আপনাকে দেখে কখনো রাগ করেছি। আমি কি কখনো এমন রাগ করেছি? আরব আহ্‌মদীরাও আমার সাথে সাক্ষাত করে। আমি কি কখনো তাদের সাথে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছি? একইভাবে আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সময়ও আমি হাসি। আমার হৃদয় সকল নিষ্ঠাবান আহ্‌মদীর জন্য ভালবাসায় পূর্ণ।

প্রশ্ন: আমরা আমাদের শিশুদের বিশ্বাসকে আমাদের অআহ্‌মদী আত্মীয়স্বজনের কুপ্রভাব থেকে কীভাবে মুক্ত রাখতে পারি?

প্রিয় হুযূর (আই.): প্রথমতঃ জামা'তের বিরোধী আত্মীয়রা আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে আপনারা এরকম পরিস্থিতি আসতেই দিবেন না। বিশেষভাবে যখন আপনার সন্তানরা সাথে থাকবে, তখন আপনার এমন আলোচনা পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা তখন তারা বিরূপ আচরণ করতে পারে যা বাচ্চাদের ওপর বিরূপ প্রভাব রাখতে পারে। তাদের কথা শিশুদের চিন্তা, মনোজগতকে প্রভাবিত করতে পারে। হ্যাঁ, আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন। আপনি তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারেন। তাদের বুঝাতে পারেন 'আহ্‌মদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম' যা আমাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তাদের সাথে ভালবাসাপূর্ণ আচরণের শিক্ষা দেয়। তাদের বলুন যে, আপনারা যা-ই বলেন, আমাদের কোন কষ্ট নেই। যেভাবে আমি কাবাবিরের সাথে পূর্ববর্তী মোলাকাতে বলেছি, শিশুদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে দৃঢ় চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। পিতামাতাকে ঘরে সন্তানদের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। তাদের সন্তানদেরকে ধর্ম বিষয়ে এবং আমরা কেন আহ্‌মদী- তা বুঝানো উচিত। এছাড়া তাদের নিকট প্রকৃত ইসলাম এবং আহ্‌মদী ও অআহ্‌মদীদের মাঝের পার্থক্য স্পষ্ট করা উচিত। যখন এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে, কেন তারা আহ্‌মদী? তারা বুঝতে পারবে যে, তারা কেবলমাত্র কোন ফিরকার অনুসারী না বরং আল্লাহ্‌র আদেশ এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করেছি যার আগমনের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। যিনি ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য আবির্ভূত হবেন আমরা তাকে মান্য করেছি। তাদের দেখান, আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইসলামের সেবায় সেই কাজ করছে যা ইসলামের অন্য ফিরকা করছে না। এছাড়া আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত এমন একটি জামা'ত যার শাখা-প্রশাখা আজ পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। এই জামা'ত সমগ্র বিশ্বকে বিশেষকরে মুসলিম জাতিকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করতে কাজ করে যাচ্ছে কেননা মহান আল্লাহ্ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবীর সকল মুসলমানকে এক হাতে ও একক ধর্মে ঐক্যবদ্ধ কর। অতএব এটি আমাদের কাজ এবং আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি। সাথে সাথে তাদেরকে ইসলাম তথা আহ্‌মদীয়াতের প্রকৃত শিক্ষা বুঝান যাতে তারা ভবিষ্যতে এই কাজ করতে পারে এবং আহ্‌মদীয়াতের শিক্ষা প্রচার করতে পারে। সঠিক পদ্ধতিতে ইসলাম তথা আহ্‌মদীয়াতের সেবা করতে পারে। অতএব বাচ্চাদের উক্ত তরবিয়তের জন্য অধিক সময় দিতে হবে। পাশাপাশি আপনাদের আরো বেশি চেষ্টা করতে হবে। তাই আপনার অআহ্‌মদী আত্মীয় যারা জামা'তের

বিরোধিতা করে তাদের সাথে সাক্ষাতে এমন কোন ধর্মীয় বিতর্ক করার দরকার নেই যা আপনার বাচ্চাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যদি আপনি ধর্মীয় কোন তর্ক বা আলোচনা করতে চান তাহলে আপনাদের আলাদাভাবে বাচ্চাদের অনুপস্থিতিতে করা উচিত। যতদিন পর্যন্ত তারা ধর্মকে বুঝার জন্য, আহ্‌মদী ও অন্যান্য মুসলমানের মাঝে পার্থক্য বুঝার জন্য সর্বোপরি তারা কেন আহ্‌মদী তা বুঝতে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন না করে। অতএব এ বিষয়গুলো তাদের জন্য স্পষ্ট করতে হবে, আরো বেশি পরিশ্রম করতে হবে, আরো বেশি জিহাদ করতে হবে। মহান কিছু অর্জন করতে আপনাকে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে। বর্তমানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, আমাদের সকল ক্ষেত্রে জিহাদ করতে হবে। আর একমাত্র এই জিহাদই আমাদেরকে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখবে। আর এটি শুধুমাত্র আমাদেরকেই সুরক্ষিত রাখবে না বরং এটি ইসলাম তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী পৃথিবী জুড়ে প্রচার করবে। আর আমাদের ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকবে। আপনাদের বিরোধিতার ভয় করা উচিত না কেননা এই বিরোধিতার কারণেই আমাদের জামা'তের প্রচার-প্রসার হচ্ছে। আপনারা যদি বিরোধীদের আপত্তির জবাব দেন তাহলে আপনারা নিজেদের সন্তানদের আপত্তির জবাব শিখাতে পারবেন। আর এই পদ্ধতিতে শিশুরাও শিখবে। অতএব যেভাবে আমি বলেছি, আমাদের ধারাবাহিক জিহাদ করতে হবে। দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই।

প্রশ্ন: হুযূর! আমরা কি আহ্‌মদীয়া জামা'ত ছেড়ে দেয়া কোন ব্যক্তি যে সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করে না, তার সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারি?

প্রিয় হুযূর (আই.): বন্ধুত্ব রাখায় কোন সমস্যা নেই। ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। আল্লাহ্ বলেছেন, ধর্মের ব্যাপারে কোন বলপ্রয়োগ নেই (সূরা বাকারা: ২৫৭)। কারো কাছে যদি জামা'ত ঠিক মনে না হয় এবং কিছু সময় পর যদি সে ছেড়ে দেয় এবং সে যদি কোন বিরোধিতা না করে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গালি না দেয় তাহলে আপনি তার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারেন। হতে পারে আপনার সাথে বন্ধুত্ব তার সংশোধনের কারণ হবে। সে তওবা করে জামা'তে ফেরতও আসতে পারে। কিন্তু আপনি যদি তার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে সে জামা'ত থেকে আরো দূরে সরে যেতে পারে এবং অন্য কোন ভুল পথে সম্পৃক্ত হতে পারে। আর এটি বন্ধুত্বের দাবি রক্ষার জন্যও দরকার। যদি সে বিরোধিতা না করে তাহলে তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। আর যদি সে বিরোধিতা করেও থাকে তবুও আন্তরিক সম্পর্ক রাখতে কোন সমস্যা নেই। হতে পারে যেকোন সময় আপনি তার সংশোধনের কারণ হবেন।

প্রশ্ন: সন্তানদের ইন্টারনেট ও ভিডিও গেইমসে সময় নষ্ট করা থেকে কীভাবে বিরত রাখা যায়?

প্রিয় হুযূর (আই.): বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এবং ডাক্তাররাও বলেছেন, এসব জিনিস বাচ্চাদের দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তাশক্তির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই দিনে বাচ্চাদের এক ঘণ্টার বেশি ইন্টারনেটে বসতে দেয়া উচিত না। কিন্তু যেহেতু এখন করোনার কারণে স্কুল বন্ধ এবং করোনার কারণে পড়াশোনা বন্ধ তাই বাচ্চারা বেশিরভাগ অনলাইনে পড়াশুনা করছে। যাহোক, এই ধরনের গেইমস সময় নষ্ট করে। আর শুধুমাত্র সময় নষ্ট করে না বরং টাকাও অপচয় করে কেননা এই গেইমগুলো টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এরপর যেভাবে মাদকদ্রব্যে মানুষের নেশা হয় তেমনি গেইম খেলতেও শিশুদের একই রকম নেশা হয়ে যায়। গেইম ছাড়া তারা চলতেই পারে না। এই গেইমের সময়, অনৈতিক এবং অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। গেইম খেলতে গিয়ে যখন তারা এই অশ্লীলতা দেখে তখন শৈশব থেকেই বাচ্চাদের মন-মানসিকতা কলুষিত হতে থাকে। বড় হয়ে সে আরো বিপথে চলে যায়। এজন্য বাচ্চারা কি গেইম খেলছে- সে দিকে মা-বাবার দৃষ্টি রাখা উচিত। বা ইন্টারনেট, টিভিতে কী প্রোগ্রাম দেখছে? তাদের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা উচিত, যা ব্যতীত অন্য সময় তারা ইন্টারনেট দেখতে পারবে না। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, তোমাদের দৃষ্টিশক্তি কমে যাবে, তোমাদের চিন্তাশক্তির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এর বদলে তুমি বই পড় যা তোমার মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য বেশি সহায়ক। এর পাশাপাশি তাদের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরি করুন। তাদের সাথে বসুন, সময় দিন এবং তাদের সাথে আলোচনা করুন। তবুও যদি তারা না মানে তাহলে তাদের ইন্টারনেট ও টিভিতে এমন প্রোগ্রাম দেখান যা তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করবে এবং আধ্যাত্মিকতা উন্নত করবে পাশাপাশি বিবেকের মান আরো উন্নত করবে। এই কাজগুলো আপনাদের করতে হবে। কিন্তু এছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, পিতা-মাতা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখবে যে, সন্তানরা কী দেখছে? যদি পিতামাতা শিক্ষিত না হয় আর বাচ্চারা পড়াশোনা করে এবং তারা যদি গেইম খেলে আর বাবা মা যদি গ্রাহ্যই না করে, আর তারা যদি নিজেদের নিয়েই পড়ে থাকে তাহলে তারা তাদের সন্তানদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। অতএব এ বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। সবার এই বিষয়ে চেষ্টা সাধনা করতে হবে। যাহোক, সন্তানদের যত্ন নিতে হবে। মাঝে মাঝে তাদের ওপর কঠোরতাও করতে হয়। কিন্তু মারবেন না বরং ভালবাসার সাথে বুঝাবেন যে, তোমরা এই নির্ধারিত সময়ে অমুক অমুক প্রোগ্রাম দেখতে পারবে। আর এমন প্রোগ্রাম যেখানে অশ্লীল বিজ্ঞাপন আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোকে বন্ধ করে দেয়া উচিত যাতে এগুলো আপনার ইন্টারনেটে না আসে। কিন্তু গেইমসের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। হ্যাঁ, সুস্বাস্থ্যের জন্য তারা বাইরে গিয়ে ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলতে পারে। কিন্তু তাদের বলুন যে, টিভি ইন্টারনেটে সারাদিন বসে থেকে নিজের চিন্তাশক্তি যেন নষ্ট না করে। আর এক ঘণ্টার বেশি অনুমতি নেই। একইসাথে আপনি খুব বেশি কঠোরতাও করতে পারবেন না। কারণ আজকের পৃথিবীতে বেশি কঠোরতা করলেও বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। তাই বাচ্চাদের ভালবাসার সাথে বুঝাবেন এবং তাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করবেন যাতে বাচ্চারা পিতামাতাকে বন্ধু মনে করে। এভাবে উত্তম তরবিয়ত নিশ্চিত হতে পারে। পিতামাতাকে এজন্য পরিশ্রম করতে হবে। মূল বিষয় হল, 'পিতামাতার পরিশ্রম'। যেহেতু সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তাই কষ্ট করে তাদেরকে মানুষের মত মানুষ বানাতে হবে।... *(চলবে)*

*ভাষান্তর: **মাওলানা মসীহ্ উর রহমান***

সীরাতুল মাহদী (আ.)

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মাওলানা জুবায়ের আহমদ**

(৮ম কিস্তি)

৪৪) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তোমাদের দাদা শুরুর দিকে কাদিয়ানের সম্পত্তির ওপর নিজ সত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য অনেক মোকদ্দমা দায়ের করেছিলেন এবং কাশ্মীরের চাকুরী থেকে আর অন্যান্যভাবে যা অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, সমস্তই এই মোকদ্দমায় ব্যয় করে দেন যার পরিমাণ লাখের কাছাকাছি হবে। হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন যে, সেই যুগে মোকদ্দমায় ব্যয়ের অর্থ দিয়ে তুলনামূলক শতগুণ বড় সম্পত্তি ক্রয় করা যেত। খাকসার নিবেদন করছি, দাদাজান এটা মনে করতেন যে, যা-ই হোক না কেন কাদিয়ান এবং এই এলাকার পূর্বপুরুষদের হারানো সত্ত্বাধিকার হাত করা যাবে না। আর আমি শুনেছি, দাদাজান বলতেন, কাদিয়ানের সম্পত্তি আমার কাছে এক রাজত্বের চেয়ে শ্রেয়। খাকসার বর্ণনা করছি যে, কাদিয়ানে আমাদের পূর্বপুরুষদের বসতি ছিল যারা বাবরের যুগের শেষভাগে হিন্দুস্থান এসেছিলেন। কাদিয়ানের কয়েক মাইল পর্যন্ত এবং এর আশেপাশের গ্রামগুলোর জমিদারিত্ব আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ক্ষুদ্র রাজ্য বা জায়গির হিসেবে বরাদ্দ দেয়া ছিল।

রামগড়ী শিখদের যুগে আমাদের পূর্বপুরষদের অনেক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে আর অনেক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছে। পরিশেষে রাজা রনজিৎ সিং-এর আমলে পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ আমাদের পিতৃপুরুষরা ফিরে পায় কিন্তু পরবর্তীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনায় পূর্বের অনেক অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয়। আর অনেক মোকদ্দমার পর যার মাঝে দাদাজানের কাশ্মীরের সমস্ত সম্পদ ব্যয় হয়েছে সেখানে শুধুমাত্র কাদিয়ান এবং এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রামের ওপর সত্ত্বাধিকার এবং কাদিয়ানের কাছের তিনটি গ্রামের ওপর কর্তৃত্বাধিকার আমাদের বংশের বলে স্বীকার করে নেয়। এই অধিকার এখন পর্যন্ত বহাল আছে। হ্যাঁ, মাঝখানে আমাদের বড় চাচাজানের সময় নিজ আত্মীয়স্বজনের মোকদ্দমার কারণে কাদিয়ানের সম্পত্তির একটি বড় অংশ মির্যা আযম বেগ লাহোরীর বংশধরদের নিকট চলে যায় এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর তাদের করায়ত্বেই থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সেই অংশ এখন আমাদের হাতে এসেছে। আম্মাজান বলতেন, তোমাদের বড় চাচাজানের সময় যখন কাদিয়ানের সম্পত্তির একটি বড় অংশ মির্যা আযম বেগ পেয়ে যায় তখন তোমাদের বড় চাচা ভীষণ দুঃখ পান যার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর খুব সম্ভব দুই বছরের মাথায় এই অসুস্থতাতেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। আদালতের রায় বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ জীবদ্দশায় বিরোধীদের হাতে সম্পত্তি প্রদান করে নি। খাকসার নিবেদন করছি, এটা সেই মোকদ্দমা আর সেই আদালতের সিদ্ধান্ত যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন তথা তিনি (আ.) নিজ ভাইদের এই মোকদ্দমা করতে বারণ করেছিলেন কারণ এই মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত বিপক্ষে যাবে। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, ভাই সাহেব আমার প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। পরবর্তীতে যখন আদালতের সিদ্ধান্ত এসে গেল তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ কামরায় ছিলেন। বড় চাচা রায়ের কাগজ হাতে নিয়ে বাইরে থেকে কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে আসেন আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সামনে সেই কাগজ রেখে দিয়ে বলেন, **'লে গোলাম আহমদ, জো তু কেহেন্দা সী উ হুয়াবী হো গায়া এ্যা'** অর্থাৎ, গোলাম আহমদ, যা তুমি বলতে তাই হয়ে গেল- এ কথা বলেই অচেতন হয়ে পড়ে যান। হযরত আম্মাজান বলতেন, বড় চাচাজানের মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবকে ডেকে বললেন, কর্তৃত্ব দিয়ে দাও। অতএব মির্যা সুলতান আহমদ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের হাতে কর্তৃত্ব দিয়ে দেয়। আর সম্পত্তির কিছু অংশ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে ব্যয়ের অর্থও প্রদান করে দেয়।

[এই বর্ণনায় খাকসারের পক্ষ থেকে এই যে বাক্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে যে, "কাদিয়ান আর এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রামের মালিকানার অধিকার এবং কাদিয়ানের আশপাশের তিনটি গ্রাম আমাদের জায়গির হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এটা সঠিক নয় বরং লিপিপ্রমাদের কারণে এই শব্দাবলী উদ্ধৃত হয়েছে। সঠিক

এটাই যে, 'কাদিয়ান এবং এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রামের ওপর সত্ত্বাধিকার... স্বীকার করে নেয়া হয়'- এ বাক্যটি যথাযথ হয় নি বরং অসাবধানতাবশত এই শব্দটি লেখা হয়েছে। প্রকৃত বিষয় হল, কাদিয়ানের মাঝে অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রাম যথাক্রমে কাদেরবাদ ও আহমেদাবাদ উভয়টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আবাদ করা হয়েছিল তাই কয়েকটি বাক্য যথা ' এবং এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রাম' উহ্য মনে করা শ্রেয় হবে।]

৪৫) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। খাকসার নিবেদন করছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতা মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেব ১৮৭৬ সালের জুন মাসে অথবা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক লেখা অনুযায়ী ২০ আগষ্ট ১৮৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় দাদাজানের বয়স ৮০ বছরের অধিক ছিল আর বড় চাচার বয়স ছিল ৫৫ বছরের কাছাকাছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্মের সাল সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজ লেখার মাঝেও এই বিষয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তখন জন্ম তারিখ লিখে রাখার নিয়ম ছিল না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কতক স্থানে ১৮৩৯ সাল আবার কোথাও ১৮৪০ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর (আ.) অন্যান্য লেখার মাঝে এই বিষয়ে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে তাঁর বয়স সম্পর্কিত অনুমানকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। বারাহীনে আহ্‌মদীয়া ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩ দ্রষ্টব্য। [জানা গেছে, তাঁর (আ.) সঠিক জন্ম ১৮৩৬ সালে]

[খাকসার আরো নিবেদন করছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অপর এক লেখা থেকে দাদাজানের মৃত্যুর সন ১৮৭৪ সালের জুন মাস বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমার গবেষণা মতে ১৮৭৪ বা ১৮৭৫ সাল সঠিক নয়। আর সরকারী নথিপত্র থেকে যতটুকু জানা যায় তদনুসারে ১৮৭৬ সালই সঠিক। কিন্তু হতে পারে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্মরণ ছিল না।] ... *(চলবে)*

কবিতা

গোলামে আহমদ (আ.)

সোহেল মাহমুদ

প্রিয় নবীজীর সওদা নিয়ে এলে তুমি আহমদ,
অন্ধকার এ বসুন্ধরায় দেখালে আলোর পথ।
ফাসাদ যখন জলে ও স্থলে গ্রাস করে গ্রহ তারা,
তাবৎ পৃথিবী হিতাহিত ভুলে, হয়ে গেল দিশেহারা।

ত্রিত্ববাদের মিথ্যার ফাঁদে ভেসে গেল ইসলাম,
তুমিই এসে ঘুচালে দ্বীনের অপবাদ বদনাম।
মুহাম্মদের পতাকা তুমি উড়ালে আকাশ-পানে,
মৃত বসুমতি উঠলো জেগে তোমারই আহবানে।

সারা পৃথিবীতে ডঙ্কা বাজে, আসলো কে দুনিয়ায় ?
চন্দ্র-সূর্য নুয়ে পড়ে তোমার, আগমনে বসুধায়
তোমার কলম ভেঙে ফেলে আজ, মিথ্যার যত ক্রুশ,
জ্বলে ওঠে তাই মোল্লার দল, বেড়ে ওঠে আক্রোশ।

থামো নি তুমি, থামতে পারো না, এগিয়ে গিয়েছো তবু,
শত যুলুম আর নিপীড়নে তাই সঙ্গী হয়েছে প্রভু
সব বাঁধা আর বিভেদ পেরিয়ে জাগিয়েছো ইসলাম,
আধার ডিঙিয়ে আলোর পথে আমরা ফিরে এলাম।

*****

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের 'সালানা জলসা'

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

২৭তম কিস্তি (পূর্ব প্রকাশের পর)

হুযূর (রাহে.) আরো বলেন, বাঙালি জাতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন। ওখানকার বুদ্ধিজীবি এবং সাংবাদিকরা অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভিক। তারা মোল্লাদের জঘন্য কার্যকলাপের নিন্দা করে বিবৃতি দেন এবং সংবাদ পরিবেশন করেন। সংখ্যাগুরু নিজ সমাজের অপকর্মের বিরুদ্ধে এভাবে স্পষ্টভাবে নিন্দা করা সহজ কাজ নয়। বাঙালি জাতি যেহেতু মূলতঃ সত্যপরায়ণ এবং ইনসাফের অধিকারী সেজন্যই তারা এভাবে বক্তব্য বিবৃতি দিলেও সরকার কিন্তু এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন। অপরদিকে দেশের জ্ঞানী গুণীজন-সত্যের খাতিরে এহেন ন্যায়-বাক্যও উচ্চারণ করেছেন যে, বাবরী মসজিদ ভাঙা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি বকশিবাজারে এবং রাজশাহীতে আহ্‌মদীয়া মসজিদ ভাঙাও অপরাধ। বাবরী মসজিদ ভাঙা যেমন অন্যায় তেমনি আহ্‌মদীয়া মসজিদ ভাঙাও অপরাধ।

হুযূর (রাহে.) সবশেষে বাংলাদেশের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন এবং বলেন, যে জাতি এহেন ন্যায়পরায়ণ সেই জাতি ভবিষ্যতে অবশ্যই উন্নতি করবে, অবশ্য যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সরকারের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার উন্মেষ ঘটে এবং সত্য প্রকাশে কার্পণ্য না হয়। *(পাক্ষিক আহ্‌মদী-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩)*

১০ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। এছাড়া জামাতের বিশিষ্ট আলেম বক্তাগণ নসীহতমূলক অনেক বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

১৯৯৪

৪, ৫, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৭০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। তিনি অনেক তথ্যবহুল ভাষণ দান করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং ৬ ফেব্রুয়ারি বিকালে সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ছিল নিম্নরূপ:

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক সম্মেলন শুরু

গতকাল শুক্রবার থেকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন জামা'তের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণ ৪, বকশিবাজার রোড ঢাকায় শুরু হয়েছে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

জনাব মোস্তফা আলী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্দেশ্য হল, কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে ভিত্তি করে ব্যক্তি সমষ্টির জীবনকে কলুষমুক্ত করা এবং বিশ্বময় প্রকৃত ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠা করা। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের যে চারটি বিশেষ উপাদানের আশ্রয় নিতে হবে তা হল- প্রচেষ্টা, প্রেম, প্রযুক্তি ও প্রার্থনা।

প্রচেষ্টা হতে হবে বিরামহীন, ব্যাপক সুসংগঠিত। আর আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি বিশেষ করে মানুষের জন্য অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের সব প্রচেষ্টা বৃথাবাক্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, প্রেম দ্বারা বাহিত না হলে কোন কথা কানের ভিতর প্রবেশ করলেও তা মরমে স্থান পাবে না। এ জন্যই **'ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই'** বলে কুরআনে নির্দেশ রয়েছে।

জনাব মোস্তফা আলী বলেন, প্রচারের কাজে আধুনিক প্রযুক্তিকে কেন গুরুত্ব

দিতে হবে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে। কেননা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কারণ নয়। এর মূল কারণ হল, মানুষের নিজের মন ও মানসিকতা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি নিজ থেকে মানুষের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে পারে না। এগুলো আমাদের শক্তি ও সুযোগ যোগায় মাত্র। সে শক্তি ও সুযোগকে কল্যাণ বা অকল্যাণে ব্যবহার করা মানুষের ইচ্ছার উপরে পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল বিধায় মানুষই এ জন্য দায়ী।

তিনি আরো বলেন, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বিজ্ঞান ও ধর্মকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হল বিজ্ঞান স্রষ্টার কর্মের রহস্য উদঘাটন করে ও তা নানাভাবে কাজে লাগায়। অপরদিকে ধর্মে স্রষ্টার ইচ্ছার প্রকাশ। একই স্রষ্টার কর্মে ও ইচ্ছায় বিরোধ থাকতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা বা উদ্দেশ্যের দীনতা হীনতাই অযথা এ দুয়ের মাঝে বিরোধ ঘটায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান ভিজির আলী এবং আলোচনায় অংশ নেন মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং আজিজুল হক।

জুমুআর নামাযের পর বেলা ৩ টায় শুরু হয় দ্বিতীয় অধিবেশন। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব তবারক আলী, আমীর আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয আবুল খায়ের। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা সালেহ আহমদ, শহিদুর রহমান এবং মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী। *(৫-২-৯৪ তারিখ, দৈনিক রূপালী পত্রিকার সৌজন্যে)*

সফল জলসা সমাপ্তির পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ছিল নিম্নরূপ:

সালানা জলসায় বক্তাগণ

আহ্‌মদী মুসলমানরা খতমে নবুওয়তে বিশ্বাস করে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তিনদিন ব্যাপী ৭০তম সালানা জলসা শেষ হয়েছে। এতে দেশের ৮০ টি শাখা থেকে তিন হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেন। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বক্তারা উল্লেখ করেন যে, শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আহ্‌মদীয়া জামা'ত পৃথিবীব্যাপী উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করছে। এপর্যন্ত ১৩৭টি দেশে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আহ্‌মদীগণ খতমে নবুওয়ত বিশ্বাস করে না-এই অপবাদ খণ্ডন করে বক্তারা বলেন, আহ্‌মদী মুসলমানরা প্রকৃত অর্থে খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস রাখে এবং সারাবিশ্বে হাজার হাজার মসজিদ ও মিশন স্থাপন করে ইসলাম ও খাতামান্নবীঈন (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষাকে প্রচার করে যাচ্ছে।

জলসার সমাপ্তি ভাষণে জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেন, কুরআন পাক এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত, হাদীস আমাদের শিক্ষা ও আদর্শের মূল উৎস। *(৭-২-৯৪ তারিখ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)*

১৯৯৫

বাংলাদেশ জামা'তের ৭১তম সালানা জলসা ২০-২২ জানুয়ারি ১৯৯৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। তখন সারাদেশে আহ্‌মদীদেরকে অমুসলমান করার দাবিতে তীব্র আন্দোলন বিরাজ করে। এরই মাঝে আশেকে মসীহরা ঐশী প্রেমের টানে দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে ঢাকার বকশিবাজারস্থ দারুত তবলীগে ছুটে আসেন। সকলে ঐশী প্রেরণায় দোয়ার রত হন এবং জলসার কর্মসূচি সার্থক ও সফল করতে সবাই কাজ করেন। ২০ জানুয়ারি প্রথম অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব এক প্রাণবন্ত উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন এবং ২২ জানুয়ারি সমাপ্তি অধিবেশনে ঐতিহাসিক নসীহতমূলক অনেক তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে সকলের আবেগাপ্লুত দোয়ায় জলসা সমাপ্ত হয়।

১৯৯৬

৫-৭ জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামাতের ৭২ তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষে হুযূর রাবে (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। হুযূর (রাহে) এর প্রতিনিধি হিসেবে রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন জনাব চৌধুরী মোবারক মুসলেহ উদ্দিন আহমদ।

হুযূর রাবে (রাহে.) প্রেরিত বাণী

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনার ৩ জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখের পত্র পেয়ে বিস্তারিত অবগত হলাম। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই সর্বদা মু'মিনদের জামাতকে সাহায্য করে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের সালানা জলসা সকল দিক থেকে বরকতপূর্ণ হোক। জলসায় আগত সমস্ত মেহমানদেরকে মহব্বত ভরা সালাম ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনারা এই জলসা থেকে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে ফিরে গিয়ে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি করে জামাতের কার্যক্রমে প্রাণ চাঞ্চল্যে উদ্যোগী হবেন। পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা বজায় রেখে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ এবং দোয়ার মাধ্যমে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র ময়দানে এগিয়ে চলুন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সর্বদা তার রহমতের ছায়ায় রাখুন, আমীন।

ওয়াসসালাম
মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ রাবে
(পাক্ষিক আহ্‌মদী, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৬)

কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

... (চলবে)

কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য

মাহমুদ আহমদ সুমন

বিশ্বময় মহামারি করোনার এ ভয়াবহ দিনেও মুসলিম উম্মাহ যথাযথভাবে ইসলামী নিয়মনীতি অনুসরণ করেই কুরবানীর ঈদ উদ্‌যাপন করবে, ইনশাআল্লাহ্‌। আমাদের দেশে ২১ জুলাই পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন করব।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ সামর্থ দিয়েছেন তাদের উচিত হবে কুরবানীতে অংশ নেয়া এবং বেশি বেশি কুরবানী দিয়ে গরীবদের মাঝে তা বণ্টন করে দেয়া।

কুরবানী শব্দটি মূল ধাতু 'কুরবুন' থেকে উদ্ভাত। অর্থ হল নৈকট্য লাভ করা, সান্নিধ্য অর্জন করা, প্রিয় বস্তুকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা।

শরিয়তের পরিভাষায়-নির্দিষ্ট জন্তুকে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'লার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নিয়মে আল্লাহ্‌ তা'লার নামে জবাই করাই হল কুরবানী।

ইসলামে কুরবানীর গুরুত্ব অতি ব্যাপক। এর ইতিহাস সম্পর্কে আমরা অবগত। আজ থেকে থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বছর আগের কথা। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের এক নবী ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। অতি বৃদ্ধ বয়সে তার ঘরে জন্ম নিয়েছে একটি ছেলে। এ ছেলে ছিল আল্লাহ্‌ তা'লার মহাদান। তাই খুবই আদরের। নাম তার ইসমাঈল। তিনি যখন তার পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হলেন তখন আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাইল (আ.)-কে জবাই করতে উদ্যত হলেন। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ডেকে বলেছিলেন, **'হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ'** (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৬)। হযরত ইবরাহীম (আ.) কিন্তু ছেলেকে জবাই করলেন না অথচ আল্লাহ্‌ পাক বলছেন, **'তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ'**। তাহলে কিভাবে সন্তানের কুরবানীর স্বপ্ন পূর্ণ হল এ বিষয়ে আমাদের ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

প্রথম কথা হল, ধর্মের নামে নরবলি দেয়ার প্রথা বহু আগ থেকে চলে আসছিল। আল্লাহ্‌ তা'লা রক্তপিপাসু নন যে, তার প্রিয় সৃষ্টির রক্তে তিনি তুষ্ট হবেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নের নিজ ব্যাখ্যানুযায়ী সন্তান কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'লা নরবলি প্রথাকে চিরতরে রহিত করার জন্যই মূলত এ জবাই হতে দিলেন না বরং পরে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র আদেশে পশু জবাই করলেন। নরবলি পশু বলিতে রূপান্তরিত হল।

দ্বিতীয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পুত্র ইসমাইলকে শিশু বয়সেই আল্লাহ্‌ তা'লার আদেশে মক্কার নিবিড় অরণ্যে তার মাতা হযরত হাজেরাসহ পরিত্যাগ করে এসেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে সেখানে আল্লাহ্‌র পবিত্র ও প্রাচীন কাবা ঘরের সংস্কার হল এবং মক্কা নগরী প্রতিষ্ঠিত হল। আর সেখানে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশে আবির্ভূত হলেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। এ মহান পরিকল্পনাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্‌ তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ মহান কুরবানীকে তার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ মহান কুরবানীকে দুনিয়ার সামনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ তা'লা স্বপ্নে এ আদেশ দিলেন আর অমনি হযরত ইবরাহীম (আ.) **'আসলামতু লিরাব্বিল আলামীন'** বলে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহান কুরবানীর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর সৃষ্টি হল দুনিয়াতে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ কুরবানীর আত্মা এবং শক্তি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নবী করীম (সা.) তাঁর উম্মতকে পশু কুরবানীর আদেশ দিলেন। তাই বিশ্বের প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমান প্রত্যেক বছর ১০ই যিলহাজ্জ তারিখে কুরবানী করে থাকে।

হযরত ইসমাঈল (আ.) যেভাবে পিতার ছুরির নিচে মাথা পেতে দিয়েছিলেন, কুরবানীর পশু যেভাবে ছুরির নিচে মাথা পেতে দেয় তেমনই প্রত্যেক মুসলমানের এ প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্যক যেন ধর্মের খাতিরে ইসলামের পথে তারা নিজেদেরকে এভাবে কুরবানী করে দিতে পারে। আবার কুরবানীর পশুর মত নিজেদের পশুত্বকে বলি দেয়ার শিক্ষাও আমরা কুরবানী থেকেই পেয়ে থাকি।

কেবল মাংস খাওয়াই এ কুরবানীর উদ্দেশ্য নয়। আর এতে আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের কোনো গুরুত্ব নেই। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, **'এগুলোর মাংস বা এদের রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তার কাছে তোমাদের পক্ষ থেকে তাকওয়া পৌঁছে'** (সূরা হাজ্জ: ৩৮)। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত অনুযায়ী নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশে কুরবানী পালনের মাধ্যমে প্রতি বছর একজন মুসলমান নিজের মাঝে তাকওয়াকে আর একবার ঝালিয়ে নেন যেন প্রয়োজনের দিনে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীর পশুর ন্যায় নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন।

প্রকৃত অর্থে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কুরবানী করে থাকে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বিশেষ প্রতিদান রয়েছে। যেভাবে হাদিসে এসেছে- হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কেরাম রসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কুরবানী কী? তিনি বললেন, তোমাদের বংশীয় বা রূহানি পিতা ইবরাহীম (আ.) এর আদর্শ। তারা জিজ্ঞেস করলেন, কুরবানী করে আমরা কী পাই হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন, প্রতিটি পশমের বদলে একটি পূণ্য'। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

কুরবানীর নিয়মের বিষয়ে হাদীসে এসেছে, হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট ৭ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যেতে পারে'। *(মুসলিম, আবু দাউদ)*

কুরবানীর জন্য উট, গরু, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা থেকে যে কোন পশু জবাই করা যেতে পারে। উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে দিতে হয়। যাদের সামর্থ্য আছে তারা একাই কুরবানী দিতে পারেন। যদি এমনও হয় যে, ভাগে কুরবানী দেয়ার নিয়্যত ঠিকই রয়েছে কিন্তু তিনি কারো সাথে অংশ নেয়ার সুযোগ পেলেন না আর একা একটি গরু কেনারও তার সামর্থ্য নেই সেক্ষেত্রে তিনি একটি ছাগল কিনে হলেও কুরবানী দিবেন। কারণ আল্লাহ্ বান্দার হৃদয় দেখে থাকেন। কুরবানীর আমল থেকে যেন কেউ বাদ না পড়েন এর দিকে সবার খেয়াল রাখতে হবে।

আমরা যারা কুরবানী দেয়ার নিয়্যত করেছি তাদের এ বিষয়টিও মাথায় রাখা উচিত কুরবানীর পশু হতে হবে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। কোনভাবেই ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী দেয়া যাবে না।

হযরত আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ, কান ভালভাবে দেখে নেই। যে পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গিয়েছে অথবা যার কান গোলাকার ছিদ্র করা হয়েছে বা যার কান পেছনের দিক থেকে ফেটে গিয়েছে তা দিয়ে আমরা যেন কুরবানী না করি'। *(তিরমিযি, আবু দাউদ, নিসাই)*

অপর এক হাদিসে বর্ণিত, হযরত আলী (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দিয়ে আমাদেরকে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন' (ইবনে মাজাহ)। তাই এ বিষয়টির ওপর খুব গুরুত্ব দিতে হবে– যে পশুটি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী দিব তা যেন নিখুঁত হয়। কোনভাবেই কুরবানীর পশু দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত, লেংড়া, কান কাটা, শিং ভাঙ্গা এবং অন্ধ হওয়া উচিত নয়।

কুরআন, হাদীস এবং বুযুর্গানে দীনের ভাষ্য থেকে যতটুকু জানা যায়, কুরবানীর পেছনে যে উদ্দেশ্যটি কাজ করা আবশ্যক তা হল তাকওয়া বা খোদার সন্তুষ্টি। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যে কুরবানীর পেছনে এ উদ্দেশ্য কাজ করে না সে কুরবানী সত্যিকার কুরবানীর আওতায় পড়ে না। আমরা অনেক সময় দেখি, নাম ফলানোর জন্য বা লোক দেখানো ভাব নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক কুরবানী করা হয়। তাই আমাদেরকে কুরবানী করতে হবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

কুরবানীতে গরিব মানুষের অনেক উপকার হয়। যারা বছরে একবারও মাংস খেতে পারে না, তারাও মাংস খাবার সুযোগ পায়। কুরবানীর চামড়ার টাকা গরিবের মাঝে বণ্টন করার মাধ্যমে তাদের অভাব ও দুঃখ মোচন হয়। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের মাঝে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আমরা আমাদের চামড়ার অর্থ বায়তুল মালে জমা দিয়ে থাকি। বায়তুল মাল থেকে এ অর্থ গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

শেষ করছি নজরুলের কবিতার দুটি লাইন দিয়ে। তিনি তাঁর এক কবিতায় কতনা চমৎকারভাবে লিখেছেন-

"শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে, ভণ্ড সে!
ইসলাম বলে-বাঁচ সবাই!
মনের পশুরে কর জবাই,
পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সঠিক নিয়্যতে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কুরবানী করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

দেশ ও জাতিভেদে ‘ঈদুল আযহা’ ও ঈদের দর্শন

(একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ)

মীম মিজান

“এই দিনই ‘মিনা’-ময়দানে পুত্র স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে ‘খুন ক্ষরিয়ে নে’
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!

-কাজী নজরুল ইসলাম

আমরা যদি কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসি, তাহলে তার জন্য তা-ই উৎসর্গ করতে হয় যা নিজের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। যিনি প্রেমাস্পদ তিনিও ভালবাসার বিনিময়ে সবচেয়ে মূল্যবান উপকরণ প্রতিদান হিসেবে প্রদান করেন। আমরা এক মহান রসূলের নাম জানি যিনি আল্লাহ্‌র বন্ধু ছিলেন আর তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। খোদাপ্রেমের পরীক্ষা দেয়ার জন্য আদিষ্ট হয়ে তিনি পৌঢ় বয়সে প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী দিতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে থামিয়ে বললেন:

وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

‘হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ, নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।’ *(সূরা আস সাফফাত: ১০৫-১০৬)*

আল্লাহ্ তা’লা কীভাবে এর প্রতিদান দিয়েছেন? তা এভাবে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই আত্মত্যাগের স্পৃহাকে পবিত্র কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় করে রেখেছেন।

আরবী বছরের বারতম মাস যিলহজ্জ। আল্লাহ্ তা’লার হাবীব মহানবী (সা.) কর্তৃক ঘোষণাকৃত চারটি হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহের অন্যতম মাস এটি। এছাড়া ইমলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি হল হজ্জ। আর এই মাসে আল্লাহ্ তা’লা হজ্জ আদায়ের ফরজটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ‘ঈদুল আযহা’ শব্দ দুটি মূলত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল, ত্যাগের উৎসব। আসলে এটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ত্যাগ করা।

আসুন আমরা এই আযহা বা কুরবানীর বৈশ্বিক রূপ জেনে নেই। হিব্রু ভাষায় কুরবান শব্দটি ‘নিকটে আসা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে ইসলাম ধর্মে কুরবানী হল, ত্যাগ বা উৎসর্গ। আবার ‘আযহা’ শব্দটি কুরবানী বা উৎসর্গ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ‘‘ঈদুল আযহা’’ ত্যাগের উৎসব অর্থে ব্যবহার করা হয়। ‘ঈদুল আযহা’কে ঈদুল কুরবান বা ঈদুল কুবীরও বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা পশু কুরবানীর বিষয়ে বলেন:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

‘আর তোমরা হজ্জ এবং উমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালন কর। তবে তোমরা যদি এক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য পশু কুরবানী কর।’ *(সূরা আল বাকারা: ১৯৭)*

আবার পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদাতে ‘ঈদ’ শব্দটি দেখতে পাওয়া যায় যার অর্থ হল, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আনন্দ-উৎসব। ঈদ অর্থ বার বার ফিরে আসাও বুঝায়। তাই ইবনুল আরাবী বলেছেন, ঈদ নামকরণ করা হয়েছে এ কারণে যে, তা প্রতি বছর নতুন সুখ ও আনন্দ নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে। বাংলা, উর্দু, হিন্দী, গুজরাটী এবং মালয়ী ও ইন্দোনেশিয়ার মতো অষ্ট্রোনেশিয় ভাষায় কুরবান শব্দটি আত্মত্যাগের অর্থে ব্যবহার করা হয়। এসব দেশে ‘ঈদুল আযহা’কে বলা হয় কুরবানীর ঈদ।

আফগানিস্তান ও ইরানে বলা হয় ‘ঈদে কুরবান’ চীনা ভাষায় ‘ঈদুল আযহা’কে বলা হয় ‘কুরবান জিয়ে’ আর উইঘুররা বলেন ‘কুরবান হেইণ’। মালয়শীয় ও ইন্দোনেশীয়রা বলেন, ‘হারি রাইয়া কুরবান’। তুর্কীরা বলেন, ‘কুরবান বাইরামী’, এছাড়া আজারী, তাতারীরা, বসনীয় ও ক্রোয়েশীয়রা ‘কুরবান বাইরামী’-ই বলেন। ইয়েমেন, সিরিয়া ও মিশরসহ উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে বলা হয় ‘ঈদুল কবীর’। কোন কোন স্থানে ‘বকরা ঈদ’-ও বলা হয়। নাইজেরিয়া, সোমালিয়াসহ মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে ‘ঈদুল আযহা’র ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। জার্মানীতে ‘ঈদুল আযহা’কে বলা হয় ‘অপফের ফেস্ট’ আর হাঙ্গেরীতে বলা হয় ‘আলদোজাতি উন্নেপ’।

বিখ্যাত আরবী অভিধান দআল মাওরিদ-এ ঈদ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে ভোজ, ধর্মোৎসব, পর্ব, প্রবল আনন্দ, ভূরিভোজন করা, ভোজ দেওয়া, ভূরিভোজন করানো, পরিতৃপ্ত করা

ইত্যাদি। তথা ঈদের দিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য দাওয়াত বিধায় ঐদিন ভূরিভোজন এবং বেশি বেশি করে খাওয়ার দিন, এছাড়া রোযা না রাখার দিন।

এ দিনটিতে মুসলিম জাতি তাদের সাধ্যমত উট, গরু, দুম্বা কিংবা ছাগল কুরবানী করে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে থাকে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত 'কুরবানী' কবিতায় বলেন, "তাই জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন; ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।" এখানে কবি মায়ের ভালবাসার ঊর্ধ্বে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী এক মহিয়সী নারীর স্মৃতিচারণ করে সকল মায়েদের জন্য এক অনুপম আদর্শ হয়ে ওঠার ঘটনা স্মরণ করাচ্ছেন।

কুরবানীর ঈদের উৎস অন্বেষণে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে স্বপ্নে নিজ প্রিয় বস্তু কুরবানী করার নির্দেশ দেন। এই আদেশ অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হলে আল্লাহ্ ফিরিশতার মাধ্যমে ইসমাঈল (আ.)-এর স্থলে পশু কুরবানীর নির্দেশ দেন। এই ঘটনাকে স্মরণ করে সারা বিশ্বের মুসলিমরা প্রতি বছর এই দিবসটি পালন করে। 'ঈদুল আযহা'র মরতবা অপরিসীম। এ দিন সূর্যোদয়ের পরে ২ রাকাত 'ঈদুল আযহা'র নামায আদায় করতে হয় আর নামায ও খুতবা শেষে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী দিতে হয়।

মহান আল্লাহ্‌র আহ্বানে জনক-জননী তাঁদের ঔরসজাত সন্তানকে উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হন নি। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির এই অফুরন্ত প্রেম-ভালবাসা চিরজাগ্রত হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। তাই আজও এই স্মৃতিচারণমূলক কুরবানীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে।

কুরবানীকে আরবী ভাষায় 'উযহিয়্যা' বলা হয়। 'উয্যাহিয়্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ঐ পশু যা কুরবানীর দিন জবাই করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে পশু জবাই করাকে কুরবানী বলা হয়। এটি একটি আর্থিক ইবাদত। যার কারণে সবার ওপর কুরবানী করার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কুরবানীর একটি উদ্দেশ্য যেহেতু নিজেদের পশুপ্রবৃত্তির কুরবানী করে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করা সেহেতু এই উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের গৌরব-মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কুরবানীকে বিবেচনা করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ে অনেকেই কুরবানীর মাধ্যমে নিজের আর্থিক সামর্থ্য প্রকাশ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে উক্ত প্রতিযোগিতাপ্রবণ কুরবানীর কোনো মূল্য নেই। মহান আল্লাহ্ কেবল সেই কুরবানীকেই কবুল করে থাকেন, যেটা কেবল তাঁরই প্রেম-ভালবাসায় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

প্রাক-ইসলামী যুগে মানুষ পশু কুরবানী করার পর কুরবানীর পশুর মাংস আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদন করার জন্য কাবা ঘরের সামনে এনে রেখে দিত, এমনকি পশুর রক্ত কাবার দেয়ালে লেপ্টে দিত। সূরা হজ্জের ৩৭ নং আয়াতে এ কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কুরবানীর পশুর রক্ত-মাংসের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই; তিনি যা চান তা হল, কুরবানীকারীর খোদাভীতি, আল্লাহ্‌র প্রতি একান্ত আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসচিত্তের একাগ্রতা।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজকাল মানুষও কুরবানীর পশু ক্রয়-বিক্রয়, কুরবানী ও মাংস বিতরণ নিয়ে নানান অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। লৌকিকতা এখানে প্রধান ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে অথচ লৌকিকতার ইবাদত আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত কুরবানীর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন।

লেখক:
প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, কলামিস্ট ও গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চাটুকারিতার কুফল

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, বিজাতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এবং তাদের কথায় সায় দিয়ে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, শেষ দিনগুলোতে ত্রিত্ববাদের অনুসারীদেরকেও নাজাত প্রাপ্ত আখ্যা দেয়া হয়েছে। চূড়ান্ত চাটুকারিতার ফলে অবশেষে মানুষ সেই জাতির সদস্য হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে এ কারণেই বলা হয়েছে, وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ *(সূরা আল বাকারা: ১২১)*। [অর্থ: তোমার প্রতি ইহুদী এবং খ্রিস্টানগণ ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হও]

অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মানুষকে অন্যের ধর্মকেও ভাল বলা লাগে, তাই চাটুকারিতা থেকে মু'মিনের বিরত থাকা উচিত।

এ বিষয়ে আমার প্রতিও এলহাম হয়েছে যেটি বারাহীনে আহমদীয়ায় উল্লিখিত আছে। এছাড়া আমি প্রত্যক্ষ করছি, বর্তমানে তাদের (তথা বিরোধীদের) মধ্য থেকে ব্যতিক্রম ছাড়া না আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর না-ই আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে চায়। হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে কারো মাঝে যদি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী থেকে থাকে তাহলে হয়তো সে আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে অন্যথায় জাতিগতভাবে আমাদের সাথে কেউ ভাল ব্যবহার করতেই চায় না। *(মালফুযাত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৭)*

بسم الله الرحمن الرحيم

OFFICE OF THE PRIVATE SECRETARY
TO
HAZRAT KHALIFATUL MASIH V

Assistant Private Secretary (Honorary)
KHUDDAM SECTION

Dated: May 30, 2021

Dear Brother Muhammad Zahed Ali Sahib,
Sadar Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh

Assalam O Alaikum Warahmatullah Wa Barakatohu

Hazrat Khalifatul Masih the 5th *Ayyadahu Allah Taalah* has received your letter Reference: MKAB/AB/Sadar/2020-21/677 dated 14 May 2021.

1- Huzoor Anwar *Ayyadahu Allah Taalah* wishes Eid Mubarak to all the Khuddam and Atfal of Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh.

2- Huzoor Anwar *Ayyadahu Allah Taalah* prays for all the Khuddam and Atfal of Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh that they may all be granted strength and blessings of Allah Almighty to face the issues caused by COVID-19, and all their difficulties are removed by the grace of Allah Almighty.

3- Huzoor Anwar *Ayyadahu Allah Taalah* prays that Allah Almighty remove all the difficulties from your professional and personal life and grant you peace and prosperity.

Hazrat Khalifatul Masih the 5th *Ayyadahu Allah Taalah* prays that May Allah Taalah be with you all, and grant Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh all the strength to carry out its responsibilities in the best possible manner.

Yours Sincerely

Hibatur Rehman
Incharge Khuddam Section (Assistant Private Secretary)

স্মৃতিচারণ- আমার পিতা মরহুম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

দিনটি ছিল সোমবার। আকাশ গুমোট ভাব যেন আকাশের মন খারাপ। শহরের কোলাহল যেন হঠাৎ থমকে গেছে। গাছের পাতাগুলো যেন নিরবতার মিছিলে যোগ দিয়েছে। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক দেড়টা বাজে। এমনি এক মুহূর্তে ধরাধামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে প্রভূর সান্নিধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন স্বল্পভাষী, বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ, কঠোর পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, সরল, সৎ এবং পরোপকারী এক ব্যক্তি। তাঁর জন্মের দিনটি সোমবার ছিল কিনা সঠিক জানি না তবে সোমবারেই তিনি নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানালেন। সোমবার নবীকুল শিরোমণি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জন্মদিন। আবার হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর দিনও সোমবার। এছাড়া সোমবারের দিনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহামেও মুবারক দিন বলে উল্লেখ আছে, তাই আমার বিশ্বাস, তাঁর মৃত্যুর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এমনি এক পবিত্র দিনকে বেছে নিয়েছেন। যার বিষয়ে এতক্ষণ উল্লেখ করা হল, তিনি আর কেউ নন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেব।

তবে বাস্তব জীবনে এসমস্ত গুণাবলী নিজের ভিতর লালন করতেন ফাজিলপুর গ্রামের শ্রদ্ধেয় সৈয়দ হাজী সাহেবের ছেলে মনির আহমদ সাহেবের বড় পুত্র মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, আমার বাবা।

বাংলাদেশের ফেনী জেলার ফাজিলপুর নামক এক নিভৃত পল্লীতে শ্রদ্ধেয় সৈয়দ হাজী সাহেবের ঔরসে ১৯৪৬ সালের মার্চের ৩ তারিখে জন্ম নিয়েছিল ফুটফুটে এক শিশুপুত্র। তাঁর জন্মে হয়তো ফেরেশতারাও খুশি হয়েছিল কেননা তিনি হতে চলেছেন শেষ যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিবেদিত একজন সেবক। যার বংশধারা নদীর পানির মত আহ্‌মদীয়াতের বৃক্ষের গোড়ায় অনবরত পানি সিঞ্চন করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

প্রিয় হুযূর (আই.)-এর সান্নিধ্য জনাব শাহাবুদ্দি আহমদ ও তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র

গ্রামেই মসজিদ, মাদরাসা এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানেই প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি তাঁর। শিক্ষা-দীক্ষায় কোন ঘাটতি হবার সুযোগ নেই কেননা তাঁর দাদা গ্রামের এসকল মসজিদ, মাদরাসা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত। রক্ষণশীল পরিবারে ইসলামীক পরিবেশে তাঁর বেড়ে ওঠা।

ফাজিলপুরের নিবেদিতপ্রাণ এক আহ্‌মদী জনাব সিদ্দিক সাহেব। সবার চেয়ে কেমন যেন একটু ভিন্ন গোছের মানুষ। এই সিদ্দিক সাহেব আবার আহ্‌মদীয়াতের খবর পেয়েছিলেন চিকিৎসক ডা. আলী আহমদ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি ফাজিলপুরের প্রথম আহ্‌মদী। সিদ্দিক সাহেব এবং আলী আহমদ সাহেব অনন্য ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় কারণে ব্যাপক আলোচিত সমালোচিত এবং নির্যাতিত ছিলেন এমনকি জনাব

সিদ্দিক সাহেবকে নিজ পিতা ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা দেন। ফলে সব হারিয়ে সিদ্দিক সাহেব সেলাই মেশিন কিনে দর্জির কাজ শুরু করেন এবং যৎসামান্য উপার্জন দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন তবুও আহ্‌মদীয়াত থেকে বিন্দুমাত্র দূরে সরে যান নি। তাঁর এই কুরবানী আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি পুনরায় নিজ এলাকাতেই জমানো টাকায় ৪ বিঘারও অধিক জমি ক্রয় করে পুনরায় গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ১০ শতাংশ জমি জামা'তের নামে উৎসর্গ করেন যেখানে বর্তমানে মসজিদ, কবরস্থান এবং মোয়াল্লেম সাহেবের কোয়ার্টার নির্মিত হয়েছে।

চলে আসি আমার বাবার কথায়। কৈশরের দূরন্তপনা শেষে সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। চাচা সিদ্দিক আহমদ সাহেবের কাছ থেকে আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানতে পারেন। স্বপ্নে ইমাম মাহদীর দেখা পেয়ে আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করা সৌভাগ্যবান মানুষদের মাঝে আমার পিতা একজন। অতি রক্ষণশীল কট্টর পরিবারে জন্ম নেয়া এবং জমিদারের নাতি হয়ে আহ্‌মদীয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত কোন অবস্থাতেই সহজ ছিল না। চাচা সিদ্দিক সাহেবের কুরবানী, আত্মত্যাগ, আধ্যাত্মিকতা দেখে আমার বাবা আহ্‌মদীয়াত গ্রহণে অনুপ্রাণিত হন। স্বপ্নে ইমাম মাহদীকে দেখেন এবং দেরি না করে আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেন। আহ্‌মদী হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই নির্যাতনের শিকার হতে থাকেন। অবশেষে একদিন রাতের আধারে এক কাপড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহ্‌মদী পাড়ায় এসে সম্ভ্রান্ত আহ্‌মদী পরিবারের প্রধান জনাব কফিল উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নেন। তখন বয়স মাত্র ১৮ বছর।

অধিক দিন অন্যের আশ্রয়ে থাকার সমীচীন মনে করেন নি। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা চলে আসেন এবং ১৯৬৪ সনে ১৯ বছর বয়সে বকশিবাজার দারুত তবলীগে থেকে নতুন জীবনযুদ্ধ শুরু করেন। মতিঝিল ও প্রেসক্লাবের সামনে টাইপিং মেশিনে টাইপ করে তা থেকে যা আয় হত তা দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন। স্বল্পেতুষ্ট ব্যক্তি হবার কারণে কখনোই হতাশ হতেন না। দারুত তবলীগে এসে তিনি নিজেকে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করেন। তৎকালীন দেশীয় আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব তাঁকে পরম স্নেহ করতেন। এছাড়া ওবায়দুর রহমান ভুইঞা সাহেবসহ অন্য সবাই তাঁকে ভালবাসতেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সব মানবিক কাজে তার আগ্রহ ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। জীবনের তাগিদে কঠোর পরিশ্রম করে আয় রোজগার করতে হয়েছে।

১৯৬৫ সনে চাচা সিদ্দিক মিঞাকে দিয়ে ওবায়দুর রহমান সাহেব আমার বাবাকে নিজের বোনের সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। সিদ্দিক সাহেব ফাজিলপুর থেকে ঢাকায় আসেন। বকশিবাজারে সবার থেকে পাত্রীর বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পণ্ডিত হায়দার আলী সাহেবের নাতনী- এই পরিচয় পেয়ে বিয়েতে রাজি হন। হায়দার আলী পণ্ডিত-এর নাতনী সাদেকা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

শাহনেওয়াজ নামক কোম্পানিতে স্বল্প বেতনে চাকুরী শুরু করেন। আমার মাকে সাথে নিয়ে বকশিবাজারের পাশে ছোট্ট একটি ঘরে সংসার জীবন শুরু করেন। একটি সাইকেল জোগাড় করেন যেটি দিয়ে মতিঝিলে অফিস শেষে বকশিবাজারে মসজিদে নামায পড়তে যেতেন। নামায পড়ে ঘরে ফিরতে প্রায়শই দেরি হয়ে যেত।

বলতে গেলে আমার বাবার দুটি পরিবার ছিল, একটি পরিবার বকশিবাজার মসজিদ এবং দ্বিতীয়টি আমাদের পরিবার। এ সত্ত্বেও সারাজীবন এই দুটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন। কেন্দ্রীয় মসজিদে সেবাদানের ফলে বাসায় ফিরতে দেরি হলেও আমার মা কখনো বিরক্ত হতেন না। বেতন বলতে যৎসামান্য যা-ই পেতেন, তা আমার মায়ের হাতে দিয়ে দিতেন। মা কৃচ্ছ্রতা সাধন করে একদিকে সংসার চালিয়েছেন আর অন্যদিকে সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করেছেন। অভাবের সংসার তবুও অতিথি আপ্যায়নের বিষয়ে কখনো কার্পণ্য করতেন না।

একদিনের ঘটনা, অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিক অতিথির আগমনে চায়ের কাপে ঘাটতি দেখা দেয়। আমরা কোনরূপ দ্বিধা না করে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের কাপে চা পরিবেশন করি। সেই দিনের কথা স্মরণ হলে এখনও মলিনতা ছেয়ে যায়।

পরিবারে একটু স্বচ্ছলতার আশায় ঋণ করে ব্যবসা শুরু করেন। কাপড়ের রং আমদানি করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তা বিক্রি করতেন। ক্লান্ত হয়ে এক সময় ইসলামপুর নয়া বাজারে ১৯৯২ সালে একটি দোকান ভাড়া নিলেন। এরপর থেকে ইসলামপুরেই ব্যবসা করতেন। খুব ভোরে আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করে এরপর দোকান খুলতেন আর বিকাল তিনটার আগেই ব্যবসা গুটিয়ে সোজা বকশিবাজার চলে আসতেন। যত বড় ব্যবসায়িক চুক্তিই হোক না কেন, তিনটার আগে আসতে হত অন্যথায় তিনি জামা'তের সেবার উদ্দেশ্যে বকশিবাজার চলে আসতেন। ব্যবসাকে কখনো জামা'তের কাজের চেয়ে গুরুত্ব দিতেন না। ব্যবসার ক্ষেত্রে কখনো নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দেন নি। অনেক ব্যবসায়ী যেখানে ভেজাল ছাড়া ব্যবসা অসম্ভব মনে করত সেক্ষেত্রে আমার বাবা নৈতিকতাকে ব্যবসার মূলমন্ত্র জানতেন। নারায়ণগঞ্জ ও ইসলামপুরের ব্যবসায়ীরা ধর্মীয় কারণে বাবার বিরোধিতা করলেও নীতি-নৈতিকতার বিষয়ে আমার বাবাকে সবচেয়ে খাঁটি মানুষ হিসেবে জানে। যেসকল আত্মীয় একসময় কাদিয়ানী বলে আমাদের বাসার পানি পান করা হারাম মনে করত, তারাই পরবর্তীতে আমার বাবার কাছে টাকা-পয়সা ছাড়াও বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ আমানত রেখে যেত।

নিজের বড় ছেলে (এই অধম)-কে জামা'তের সেবা করার জন্য ওয়াকফে যিন্দেগী করেছেন। খাকসার প্রায় ২২ বছর যাবত জামা'তের খেদমত করার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

খাকসারের পিতা জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেবের সর্বজ্যেষ্ঠ কন্যা দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ার সুযোগ লাভ করেন তখন একজন রক্ষণশীল মনোভাবের মানুষ হিসেবে আমার বাবা তার মেয়েকে সহশিক্ষায় ভর্তি করান নি। আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের খাতিরে তাঁর এই ত্যাগ বৃথা যায় নি বরং সরকারি ইডেন মহিলা কলেজে পড়াশুনার পাঠ শেষ করে বর্তমানে তিনি একটি স্বনামধন্য কলেজের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ কন্যাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান। তখন তিনি হুযূর (আই.)-এর নিকট পত্র দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেন। ভর্তির সময় ঘনিয়ে আসছিল এবং চিঠির উত্তর আসতে দেরি হচ্ছিল। সবাই বলছিল উত্তর ইতিবাচকই আসবে, আপনি ভর্তি করিয়ে দেন, কিন্তু আমার পিতা নিজ সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। প্রয়োজন হলে মেয়েকে ভর্তি করাবেন না তবুও হুযূর (আই.)-এর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবেন। যুগ-খলীফার প্রতি আনুগত্যের এমন দৃষ্টান্ত আজ সত্যিই প্রয়োজন।

তিনি কখনই জাগতিকতাকে প্রাধান্য দেন নি, নিজ সন্তানদের যেমন আদর যত্ন করে রেখেছেন ঠিক তেমনি সন্তানরা যেন জামা'তকে ধরে রাখে, জামা'তের কাছে থাকে- তার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তিনি করেছেন। ফলে মহান আল্লাহ্ তার সকল সন্তানকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হবার এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার তৌফিক দান করেছেন এবং রিজিকের প্রাচুর্য দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

তিনি নিজ সন্তানদের প্রায়ই বলতেন, "যে বাড়িতে জামা'ত অথবা জামা'তের কর্মকর্তাদের বদনাম করা হয়, সেই বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়"। তিনি তার শেষ জামা'তি বক্তব্যে বলেছিলেন "যারা বাইতুল মালের টাকা দিতে দেরি করে অথবা নিজ প্রয়োজনে খরচ করে, তারা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়"। জামা'তের যেকোন সিদ্ধান্তে তিনি আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি স্বভাবগতভাবে কর্মক্ষেত্রে এবং বাকি সবার সাথে খুব কম কথা বলা এবং নিরব থাকা সত্ত্বেও আমার মায়ের সাথে তিনি অনেক গল্প করতেন। নিত্যদিনের ঘটনা, ব্যবসায়িক বিষয়াদি– সবকিছু মায়ের সাথে শেয়ার করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। মা হাসপাতালে ভর্তি হলে নিরলসভাবে মায়ের সেবা করেছেন। খাকসারের মা-ও আজ প্রয়াত।

তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। এমনই মিতব্যয়ী ছিলেন যে, আরেক ব্যক্তির কাজ করে দেয়ার সময় কাজের মান বজায় রেখে কীভাবে সেই ব্যক্তির ব্যয় কমিয়ে আনা যায়- সেদিকে সর্বদা খেয়াল রাখতেন।

নিজ প্রচেষ্টায় ফাজিলপুরে তাঁর চাচার ওয়াক্‌ফ করা জমিতে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন। সম্পূর্ণ নোয়াখালীতে আহ্‌মদী মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ, মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণ এবং আহ্‌মদীদের কবরস্থান-এর জমিতে মাটি ভরাট করা– এ সবই নিজ জীবদ্দশায় অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করে গেছেন।

সম্পত্তি নিয়ে কখনো দ্বন্দ্বে জড়াতেন না। এর ফলে নিজ গ্রামের ভিটাসহ জমিজমা নিজ ভাইদের লিখে দিয়ে চলে আসেন। ঋণের বোঝা সন্তানদের ওপর চাপান নি বরং জীবদ্দশাতেই সকল ঋণ শোধ করে গেছেন এমনকি ওসিয়্যতের সম্পূর্ণ অর্থ জীবদ্দশাতেই পরিশোধ করে গেছেন।

শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। নিজ নাতি-নাতনীদের জন্য সর্বদা দোয়া করতেন। কখনো নিজের দুঃখ-কষ্ট অন্যদের বুঝতে দিতেন না। কোন বিষয় নিয়ে হতাশা প্রকাশ না করে সদা দোয়ায় রত থাকতেন।

শেষ অসুস্থাবস্থায়ও বকশিবাজারে এসে জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। নামাযের ক্ষেত্রে সদা জাগরূক ছিলেন এমনকি হাসপাতালে যতদিন জ্ঞান ছিল ততদিন তিনি নামায আদায় করেছেন।

তাঁর জানাযা নিজ গ্রামে উপস্থিত হলে লক ডাউনেও অসংখ্য মানুষ এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসেন। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং জানাযার নামাযের ইমামতি করেন।

মরহুমের জ্যৈষ্ঠপুত্র
মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম
মুরব্বী সিলসিলাহ

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্

(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

পূর্ব প্রকাশের পর

কিছু কিছু পুরুষ এতটা অত্যাচারী ও অনাচারী হয়ে থাকে যে, অত্যন্ত নোংরা অপবাদ আরোপ করে মহিলাদের দুর্নাম করে। অনেক সময় নারীরাও এমনই আচরণ করে। কিন্তু পুরুষদের যেহেতু উপায় উপকরণ বেশি, শক্তি বেশি এবং বাহিরে চলাফেরা বেশি তাই তারা এ থেকে বেশি সুযোগ নেয়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! যারাই লাভবান হওয়ার আত্মপ্রসাদ নিচ্ছে তারা নিজেদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করছে। কাজেই খোদাকে ভয় করুন এবং এ ধরণের কাজ পরিত্যাগ করুন। নির্যাতনের ক্ষেত্রে অনেকে তো এতদূর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে, ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে অন্য দেশে চলেগেছে আবার তারা আহ্‌মদী হওয়ার দাবিও করে। হতভাগীনি মা চিৎকার ও আহাজারী করে। মায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় অপবাদ আরোপ করে তাকে ছেলেমেয়েদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। যদিও আমরা দেখেছি

পবিত্র কুরআন বলে, হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অপবাদ আরোপ করো না অথচ এই পুরুষের, এমন পিতার সকল আত্মীয়স্বজন তার সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। এমন পুরুষ ও তার সহায়তাদাতা আর এমন আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে জামা'তী ব্যবস্থাপনার উচিত তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

এখন দেখুন! পবিত্র কুরআনের শিক্ষা কী আর এমন লোকেদের আচার ব্যবহার কেমন? দুঃখ এজন্যে হয় যে, অনেক কর্মকর্তাও অনেক সময় এ ধরনের পুরুষকে সাহায্য করে থাকে আর কোথাও তাকওয়া অবলম্বন করা হয় না। অতএব এসব অপবাদ, সন্তানদের বিবৃতি এবং ছেলেমেয়েদের সামনে মা সম্পর্কে কটুক্তি যা চরম অসঙ্গত, যা সন্তানদের চরিত্রও ধ্বংস করে থাকে। এমন পুরুষ তার আমিত্বের খাতিরে সন্তানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করে। এভাবে কতক পুরুষের ধর্মীয় আত্মাভিমান লোপ পায়। এসব ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনা থেকে এখরাজ বা বহিষ্কার করা হয় তাহলেও তারা ভ্রুক্ষেপহীন থাকে এবং নিজেদের আমিত্বের পিপাসা নিবারণের জন্য তারা ধর্ম পরিত্যাগ করে।

যাহোক, যেভাবে আমি বলেছিলাম, আসল কাজ হল অন্যায়ের নিরসন এবং ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। খিলাফতের আবশ্যিক দায়িত্বাবলীর মাঝে ইনসাফ করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা একটি গুরুদায়িত্ব। অতএব জামা'তের কর্মকর্তারাও যেন এই দায়িত্ব অনুধাবন করেন। কেননা তারা যে জামা'তী ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করছেন তা যুগ-খলীফার প্রতিনিধিত্বে করছেন। কাজেই ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের সকল দাবি পূর্ণ করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব। প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ্ তা'লাকে হাযির-নাযির জেনে এই দায়িত্ব পালন করা। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এবং যুগ-খলীফার কাছে সুপারিশ করার সময় সকল প্রকার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে থেকে সুপারিশ করা বাঞ্ছনীয়। কারো আচরণে যদি তাৎক্ষণিকভাবে রাগ হয় তবে দু'দিন অপেক্ষা করে সুপারিশ করা উচিত যেন কোন ধরণের পক্ষপাতমূলক মতামত সামনে না আসে। এছাড়া দুই পক্ষকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক সময় নিজের অধিকার আদায়ের নামে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে বরং এভাবে বলা উচিত যে, অবৈধ অধিকার দাবি করে।"

যাহোক, যেভাবে আমি বলেছিলাম, আসল কাজ হল অন্যায়ের নিরসন এবং ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। খিলাফতের আবশ্যিক দায়িত্বাবলীর মাঝে ইনসাফ করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা একটি গুরুদায়িত্ব। অতএব জামা'তের কর্মকর্তারাও যেন এই দায়িত্ব অনুধাবন করেন। কেননা তারা যে জামা'তী ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করছেন তা যুগ-খলীফার প্রতিনিধিত্বে করছেন। কাজেই ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের সকল দাবি পূর্ণ করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব। প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ্ তা'লাকে হাযির-নাযির জেনে এই দায়িত্ব পালন করা। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এবং যুগ-খলীফার কাছে সুপারিশ করার সময় সকল প্রকার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে থেকে সুপারিশ করা বাঞ্ছনীয়। কারো আচরণে যদি তাৎক্ষণিকভাবে রাগ হয় তবে দু'দিন অপেক্ষা করে সুপারিশ করা উচিত যেন কোন ধরণের পক্ষপাতমূলক মতামত সামনে না আসে। এছাড়া দুই পক্ষকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক সময় নিজের অধিকার আদায়ের নামে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে বরং এভাবে বলা উচিত যে, অবৈধ অধিকার দাবি করে।"

যেভাবে আমি বলেছিলাম, কোন কোন পিতামাতা সন্তানদেরকে অন্য দেশে নিয়ে গিয়েছে অথবা তাদেরকে লুকিয়ে ফেলেছে বা কোর্টে ভুল তথ্য দিয়ে কিংবা ভুল তথ্য প্রদান করিয়ে সন্তানদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মাকে যেন তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয় আর পিতাকেও যেন তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি তাকওয়ার পথ অনুসরণ না কর আর পরস্পরের প্রাপ্য প্রদান না কর তবে তোমরা স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা সব বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। তিনি জানেনও আর দেখছেনও। আল্লাহ্ অত্যাচারীকে এমনিতেই ছেড়ে দেন না। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং সর্বদা যে বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে তা হল আপনার ওপর যেভাবে আপনার মায়ের অধিকার রয়েছে ঠিক একইভাবে আপনার সন্তানদের ওপরও তাদের মায়ের অধিকার রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি এবং বিচার বিশ্লেষণেও উঠে এসেছে, সাধারণত পিতাদের পক্ষ থেকেই এই অন্যায় বেশি হয়ে থাকে। এজন্য আমি পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি যত্নবান হোন। তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন। আপনি যদি পুণ্য ও তাকওয়ার পথের পথিক হয়ে থাকেন তবে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মোটের ওপর স্ত্রীরা আপনাদের অনুগতই থাকবে। আপনাদের সংসার ভাঙ্গার পরিবর্তে গড়ে উঠবে, যা এর চার পাশের পরিবেশকে সুন্দর দৃশ্য উপহার দেবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার এক সাহাবীকে একটি উপদেশমূলক পত্রে লেখেন যে, "পীড়াদায়ক বিষয় হলো, আপনার কিছু সত্যিকার বন্ধু, যারা সত্যিকার অর্থেই আপনার সাথে আন্তরিকতা ও ভালবাসা রাখে এবং আপনার প্রতি সুধারণা পোষণ করে, তাদের মুখে শুনেছি যে, পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে যেমন (আচরণ) করা উচিত (সেই তুলানায়)

আপনি কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শন করে থাকেন। অর্থাৎ রাগ ও ক্রোধ প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় ভারসাম্য বজায় থাকে না। আমি এই অভিযোগটি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখি নি। কেননা প্রথমত বর্ণনাকারী আপনার সকল প্রশংসনীয় গুণে বিশ্বাসী এবং আপনার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করেন আর দ্বিতীয়ত অনাদি অনন্ত বণ্টনকারী খোদা নারীর ওপর পুরুষকে একগুণ বেশি ক্ষমতা দিয়ে রাখার কারণে সমান্য সামান্য বিষয়ে শিষ্টাচার শিখানোর উদ্দেশ্যে বা আত্মাভিমানের নামে সে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) মহিলাদের সাথে সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পরম সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, তাই আমি প্রয়োজন অনুভব করলাম যে, আপনার মত সঠিক পথের পথিক ও পুণ্যবান মানুষকে এই নির্দেশ সম্পর্কে কিছুটা অবগত করি। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেন, عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ *(সূরা আন নিসা: ২০)*। অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীর সাথে তোমরা এমনভাবে জীবনযাপন কর যাতে কোন বিষয় ন্যায়সঙ্গত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি না হয় আর যেন কোন পশুত্ব বা হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে বরং এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় তাদেরকে তোমরা নিজেদের এক আন্তরিক বন্ধু মনে কর এবং সদ্ভাবে বসবাস কর। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। সুন্দর সামাজিক জীবনযাপনের জন্য এতটা জোর দেয়া হয়েছে যে, আমি এই চিঠিতে তা লিখে শেষ করতে পারব না। হে আমার প্রিয় ভাজন! স্ত্রী এক নিরীহ ও দুর্বল সত্তা যাকে খোদা তা'লা তার হাতে ন্যাস্ত করেছেন আর তিনি দেখেন, প্রতিটি মানুষ তার সাথে কী আচরণ করে। কোমলতা প্রদর্শন করা উচিত আর সব সময় মানসপটে এই ভাবনা ও চেতনা বিরাজমান থাকা উচিত যে, আমার স্ত্রী একজন প্রিয় অতিথিনী, যাকে খোদা আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন আর আমি আতিথেয়তার শর্তাবলীর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল তা তিনি দেখছেন। আমি খোদার একজন দাস এবং সেও খোদার একজন দাসী। তার ওপর আমার কীই-বা প্রাধান্য? মানুষের রক্তপিপাসু হওয়া উচিত নয়। স্ত্রীদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া উচিত এবং তাদেরকে ধর্ম শিখানো উচিত। মূলত এটিই আমার বিশ্বাস যে, মানুষের চরিত্র কেমন তা পরীক্ষা করে দেখার প্রথম ক্ষেত্র হলো তার স্ত্রী। যখনই আমি আমার স্ত্রীর সাথে দৈবাৎ সামান্যতম কঠোরতাও করি তখন আমার শরীর এ কথা ভেবে কেঁপে উঠে যে, এক ব্যক্তিকে খোদা শত শত ক্রোশ দূর থেকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন, আমার পক্ষ থেকে এমন আচরণ হয়ত পাপে পর্যবসিত হবে। তখন আমি তাকে বলি, তুমি তোমার নামাযে আমার জন্য দোয়া কর, এটি যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পরিপন্থি হয়ে থাকে তবে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন; আমার ভয় হয় যে, কোথাও আমরা আবার কোন অন্যায় কাজে না জড়িয়ে পড়ি। সুতরাং আমি আশা করি, আপনিও এমনটি করবেন। আমাদের নেতা ও মনিব রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে কতইনা নমনীয়তা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতেন! এর বেশি আর কী লিখব? ওয়াস্‌সালাম।" *(আল হাকাম, ৯ম খণ্ড, নম্বর-১৩, ১৭ এপ্রিল ১৯০৫, পৃ. ৬)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে সেই সুন্দর কাজগুলো করার সুযোগ দিন যা তাঁর রসূল (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন। *(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টান্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)*

এমন সব বিষয় সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে হুযূরে আনোয়ার (আই.) বলেছেন–

"কিছু পুরুষ ভ্রান্ত এবং নোংরা অপবাদ দিয়ে স্ত্রীদেরকে ছেড়ে দেয় যা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে এমন লোকের মামলা কাযা বা বিচারবিভাগের নেয়াই উচিত নয়। আমীর সাহেবের উচিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এদেরকে সরাসরি এখরাজ বা বহিষ্কারের সুপারিশ করা। বস্তুত কানাডাসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে এই নোংরামি মাথাচাড়া দিচ্ছে।" *(জুমুআর খুতবা, ২৪ জুন ২০০৫, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, টরেন্টো, কানাডা; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৮ জুলাই ২০০৫) .. (চলবে)*

(আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্, পৃ. ৬৩-৬৭)

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন
www.theahmadi.org
পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

■ গত ১৪/০৫/২০২১ বৈশাখী আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ সোহেল মিয়া, হাতী লেট, বাবুলের বাজার, ফুলবাড়ীয়া-এর সাথে শাহাদাত মোল্লা, পিতা: মৃত আব্দুল হামিদ মোল্লা, চন্দ্রপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৭৭৬

■ গত ০২/০৬/২০২১ মফিজা পারভিন, পিতা: মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ফকির, মীরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান, পিতা: মোহাম্মদ আশেকুর রহমান, মুন্সী পাড়া, চুয়াডাঙ্গা-এর বিবাহ ১,১০,০০০/- (এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৭৯

■ গত ০৯/০৪/২০২১ জাকিয়া খানম, পিতা: আকবর খান, ১৪/১ মৌসুমী আ/এ, পশ্চিম নাছিরাবাদ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ রাসেল, পিতা: মোহাম্মদ বাদশা মিয়া, পুরাতন চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৭৭

■ গত ১৮/০৬/২০২১ জান্নাতুল ফেরদৌস, পিতা: মৃত মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, টঙ্গি, গাজীপুর-এর সাথে মোস্তাক আহমদ, পিতা: মৃত মোহাম্মদ খুরশিদ আলম, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৭৮০

গত ১৫/০৫/২০২১ মোছা: আদুরী আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ আবুল হোসেন, পূর্ব ছিলমানের পাড়া, বারকোনা, সাঘাটা, গাইবান্ধা-এর সাথে মোহাম্মদ রাশেদ মিয়া, পিতা: মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, খামার ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা-এর বিবাহ ১,০২,০০০/- (এক লক্ষ দুই হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৭৭৮

■ গত ১৮/০৬/২০২১ তাহমিনা আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ তৌফিক, ভেলারতল, ফুলতলা, বোদা, পঞ্চগড়-এর সাথে মাহফুজুল হক, পিতা: মৃত আবদুল লতিফ, দিলালপুর, বিন্দিরধর, সৈয়দপুর-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৭৮১

সংবাদ

দূর্গারামপুরের উদ্যোগে মহান খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন

গত ০৪/০৬/২০২১ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, দূর্গারামপুরের উদ্যোগে মহান খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত খিলাফত দিবসে সভাপতি সাহেবের আসন গ্রহণের পর রীতিমত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর উর্দু নযম পেশ করা হয়। এরপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। বক্তাগণ খিলাফতের গুরুত্ব, তাৎপর্য, কল্যাণ ও খিলাফতের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন। সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খিলাফত দিবস, ২০২১-এর দেওয়া বক্তব্য ইউটিউব থেকে মোবাইলে সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা হয়। পরে সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাত সহ মোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিল।

প্রেসিডেন্ট, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, দূর্গারামপুর

মিরপুরে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) শীর্ষক আলোচনা ও তবলীগী প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত

গত ১৯ জুন, ২০২১ শনিবার আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর-এর উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) শীর্ষক আলোচনা ও তবলীগী প্রশ্নোত্তর পর্ব মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। মাগরিব ও এশার নামাযের পর সভার কাজ শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর-এর আমীর মোকাররম আলহাজ্ব মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয আবুল খায়ের সাহেব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন ও আগত মেহমানদের (জেরে তবলীগ) বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও মাওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

রাত ৯.৩০ মি. পর্যন্ত চলমান এই অনুষ্ঠানে ৬৫ জন অআহ্‌মদী (জেরে তবলীগ) মেহমান যোগদান করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে ৪ জন বয়আত গ্রহণ করে আহ্‌মদীয়া জামা'তে দাখিল হন। আলহামদুলিল্লাহ। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম স্বপন
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, দূর্গারামপুর

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষকরে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

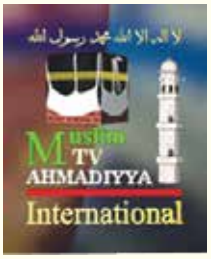

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO ENTERTAINMENT REIMAGINED
JUNCTION

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি

বি. ডি. এস (ঢাকা), পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন), পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময় ঃ
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা
(মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য ঃ ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

New Vol. No. 84 | 01st Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

15th July, 2021 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**
২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।
২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।
২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:
ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِى وَانْصُرْنِى وَارْحَمْنِى

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)